মঞ্জরী।



"নাইতো তেমন বনে কুসুম
মনে যেমন ফোটে ফুল"
গিরীশচন্দ্র ?

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ঘুঘুডাঙ্গা।

১৩১৯

কলিকাতা
৮নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
"তারা-প্রেস"
শ্রীরাজকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।

পরমারাধ্যা স্নেহময়ী

শ্রীযুক্তা রাণী কৃষ্ণকামিনী চৌধুরাণী

শ্রীশ্রীচরণকমলে—

মা,

মা থাকিতেও অতি শিশুকাল হইতে তোমাকেই মা বলিয়া জানি, মা বলিয়া ডাকি। তুমি আমার পিসিমা, কিন্তু তোমাকে আমি মায়ের অধিক মনে করি। তোমারই স্নেহ যত্নে আমার জ্ঞান বুদ্ধি শরীর বর্দ্ধিত; আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার মহিমা মণ্ডিত; এ গল্পগুলিও তোমারই স্নেহের কোলে রচিত;—তাই তোমারই পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

সুরেন্দ্র কুটীর, গুবুডাঙ্গা পোঃ,
১লা বৈশাখ ১৩১৯ সাল।

তোমার স্নেহের সন্তান
সুরেন।

সূচীপত্র।

গ্রন্থকারের নূতন পুস্তক "তন্বী" যন্ত্রস্থ।

ভূমিকা।

"মঞ্জরীর" একটা ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি বিশেষ-ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। যাঁহারা বাঙ্গলা-ভাষায় ছোট গল্প লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও উপর এই ভূমিকা লিখিবার ভার অর্পণ করিলে সঙ্গত ও শোভন হইত। কিন্তু গ্রন্থকার আমার লিখিত ভূমিকাই চান। আমি দেখিতেছি, আমার পক্ষে ইহা একটী শুভযোগ। গ্রন্থকারের বহু যত্ন চেষ্টায় লিখিত পুস্তকের সঙ্গে আমার যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত ও "অ"কার প্রধান নামটা যদি ছাপার অক্ষরে থাকিয়া যায়, মন্দ কি!

অপরের লিখিত পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে হইলে কি বলা প্রয়োজন ও সুশোভন, তাহা অনেক ইংরাজী বাঙ্গলা গ্রন্থে অপরের লিখিত ভূমিকা পাঠ করিয়াও আমি নিরাকরণ করিতে পারি নাই। ভূমিকার অর্থ কি সমালোচনা? অথবা গ্রন্থকারের প্রশংসা-পত্র?

ভূমিকা অর্থে যদি সমালোচনা হয়, তাহা হইলে আমি যাহা লিখিতেছি তাহা নিশ্চয়ই ভূমিকা নহে। তারপর গ্রন্থকার যখন আমার নিকট প্রশংসা-পত্রের প্রার্থী নহেন, তখন সে অর্থেও আমার ভূমিকা সম্পূর্ণরূপেই নিরর্থক।

ভূমিকা।

আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় ছোট গল্প লেখার একটা "আমল" আসিয়াছে। ইহা সাহিত্যের পক্ষে শুভসূচক কি না, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে কথার আলোচনার অবকাশ নাই। কিন্তু ছোট গল্প-পাঠকের সংখ্যা যে দিন দিন বাড়িতেছে, বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রগুলি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যে মাসিক পত্রের প্রতি সংখ্যায় একটী বা ততোধিক ছোট গল্প না থাকে সে পত্রের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভবপর নহে।

সাহিত্যরথী, প্রতিভাবান্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে, আজকাল অনেক ছোট গল্প বাহির হয়। সেগুলি যে "ছোট" সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি গল্প নহে। কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, ছোট গল্প রচনা খুব সহজসাধ্য—ইহাতে সাফল্য-লাভ অনায়াসলভ্য। যাহার লেখাপড়া অধিক দূর অগ্রসর হয় না, সে যেমন হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসক হয়, তেমনই যে ব্যক্তি বাণীর সেবা করিতে গিয়া অপর কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারে সে ছোটগল্পের লেখক হয়। কিন্তু আমার বোধ হয়, হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসায় যে নৈপুণ্য অত্যাবশ্যক, ছোট গল্প রচনায় লেখকের লিপি-কুশলতা ও তদনুরূপ প্রয়োজনীয়।

ভূমিকা।

অনুভূতি, আন্তরিকতা, ভাবের সংযম ও ভাষার সমৃদ্ধি সাহিত্য সাধনায় সাফল্য-লাভের সুপ্রশস্ত রাজ-পথ। ছোট গল্প লেখকের পক্ষেও এই পন্থাবলম্বনই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য। যাঁহাদের লেখনীর গতি অবাধ, অপ্রতিহত, দ্রুত, যাঁহারা বর্ণনার ঝোঁক সামলাইতে অসমর্থ, যাঁহারা বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবার জন্য অকারণে বাক্য-পল্লবের সৃষ্টি করিয়া ভাষার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করেন, ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধিলাভ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। অবান্তর প্রসঙ্গ ও অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা ছোটগল্পে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় ও পরিহার্য্য। বর্ণনা বাহুল্যেও তেমনই ছোট গল্প শ্রীহীন হইয়া যায়।

ছোটগল্পে কথোপকথন প্রবর্ত্তন করিবার প্রলোভন-পরিহার বিধেয়। কথোপকথন অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায়তা করে সত্য, কিন্তু নিপুন কলাশিল্পী ব্যতীত তাহার ব্যবহার অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে। পরন্তু, কথোপকথনের প্রত্যেক কথাটীর উপযোগিতা ও সার্থকতা প্রতিপন্ন না হইলে গল্পের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা সমধিক প্রবল হয়। আমার যাহা ধারণা অন্ততঃ ছোট গল্প লিখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই বলিলাম।

ভূমিকা।

"মঞ্জরীর" লেখক মহাশয় কয়েকটী ছোট গল্প লিখিয়াছেন। গল্পগুলি ছোটও বটে, গল্পও বটে। আমি উপরে ছোট গল্প রচনার সাফল্য লাভের যে উপায় নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার সহিত এই আলোচ্য গল্পগুচ্ছের পূর্ণ সঙ্গতি পরিলক্ষিত হইয়া না থাকিলেও নবীন গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমে যতটা সাফল্য লাভ সম্ভব তাহার প্রভূত পরিচয় এ গ্রন্থে আছে। নবীন গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা অল্প শ্লাঘার কথা নহে। ছোট গল্পের যাহা 'জান' তাহা এই নবীন লেখক ধরিতে পারিয়াছেন।

গল্পগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। সে বিচার পাঠকগণ করিবেন। তবে একটা গল্পের উপসংহার ভাগ সম্বন্ধে একটী কথা আমি বলিতে চাই। লতিফের পক্ষে এমন করিয়া প্রকাণ্ড ডাকাতের দলটাকে ডিনামাইটে উড়াইয়া দিয়া নিজের প্রনয়িনীকে লইয়া "চাচা আপন বাঁচা" এই প্রবচনের অনুসরণ শোভন হয় নাই। ইহাতে আদর্শ খাটো হইয়া গিয়াছে। গল্পাংশে এই প্রকার দুই একটী ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়। নবীন লেখকের পক্ষে এরূপ ত্রুটী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ভূমিকা।

ত্রুটীর উল্লেখ করিলাম, গুণের ও একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন "তুলার খেলা" গল্পটী যেমন সুন্দর, তেমনই সময়োপযোগী হইয়াছে। এই গল্পটাতে মাখন বাবুর চিত্র বড়ই পরিস্ফুট হইয়াছে এবং লেখক যে পরে ছোট গল্প লিখিয়া যশোভাজন হইবেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এই গল্পে পাওয়া যায়।

উপসংহারে একটী কথা বলিব। এই গল্পগুলির স্থানে স্থানে ভাববিন্যাস শিথিল হইয়া গিয়াছে, এবং ভাষার পরিমার্জ্জন ও প্রসাধনের অবকাশও আছে। সত্বর গ্রন্থ প্রকাশের ব্যস্ততা বশতঃ মুদ্রাকর প্রমাদেরও অসদ্ভাব নাই। তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে নবীন লেখকের এই প্রথম উদ্যম বিফল হইবে না। সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার এই উপচীয়মান সাহিত্য বিটপী ফল ফুলে মণ্ডিত হইয়া বাণীর কুঞ্জের শোভাবর্দ্ধন করিবে।

শ্রীজলধর সেন।



মঞ্জরী।

—ঃ—

দাদামহাশয়।



সন্তোষ তাহার দাদামহাশয়ের পাকা চুল তুলিতে তুলিতে গল্প শুনিতে ব্যস্ত; গল্পের রাজপুত্র তখন কেবল, রাক্ষস খেক্কিসের আবাস হইতে, কি করিয়া পলায়ন করা যায়, রাজকন্যার সঙ্গে সেই পরামর্শ করিতে-ছিল। এমন সময় সন্তোষের মাতা বাহিরের ঘরের দরজাটী ঠেলিয়া, ঈষৎ ঘোমটামণ্ডিত মুখখানি বাহির করিয়া, ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, পড়াশুনা নাই, কেবল দিন রাত্রি গল্প শুনা? উনিইতো কেবল গল্প ব'লে ব'লে

ছেলেটার মাথাটা খেলেন। ওর কি আর কিছু হবে? সে স্বরে বালক চমকিয়া দরজার দিকে চাহিল, মায়ের সেই ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া, ব্যাকুল ভাবে দাদামহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। দাদামহাশয়ও ব্যাকুল হইলেন; আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, এই যাচ্ছে, এখনতো মাষ্টার আসেনি? পুত্রবধু বলিলেন, মাষ্টার আসেনি ব'লে কি প'ড়তে নেই? যা', প'ড়তে যা'। সন্তোষ আবার দাদামহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল; দাদামহাশয় সস্নেহে বলিলেন, তা দাদা এখন প'ড়তে যাও—রাত্রে আবার গল্প ব'লব এখন। নিতান্ত অনিচ্ছায় সন্তোষ পড়িতে গেল। তখন সান্ধ্য-আকাশে দু' একটী মাত্র তারা সবে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধ কালীশঙ্কর বসু উঠিয়া—সন্ধ্যা করিতে ঘাটে গেলেন। চক্ষু মুদিয়া তিনি ভগবানকে ডাকিতেছিলেন—কি পৌত্র সন্তোষ-কুমারের সুকুমার মুখখানি স্মরণ করিয়া স্নেহবিগলিত হইতেছিলেন, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।

(২)

কালীশঙ্কর বসুর পত্নী, তিন মাসের সন্তান হরিপদকে রাখিয়া, পতির কোলে মাথা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

কালীশঙ্কর বসু আর বিবাহ করিলেন না। মাতৃহারা সন্তানকে একাই পিতা ও মাতার স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন, বৃদ্ধ সে কথায় উত্তর দিতেন না— ঈষৎ হাসিতে চেষ্টা করিয়া, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কাজেই কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। তাঁহার মাতাও অনেক পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সংসারে বিশেষ কোন নিকট আত্মীয় স্ত্রীলোক ছিলেন না। কাজেই হরিপদের সমস্ত ভার একা কালীশঙ্করকেই বহন করিতে হইত। তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া, দেশে গিয়া, যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল তাহাতেই কালীশঙ্কর দিন যাপন করিতে লাগিলেন। গ্রামে এন্‌ট্রান্স স্কুল ছিল। হরিপদ বৃত্তির সহিত এন্‌ট্রান্স পাশ করিল। বৃদ্ধের সে দিন আনন্দের পরিসীমা ছিলনা। বৃদ্ধ তখন স্থির করিলেন, এইবার হরিপদকে বিবাহ দিয়া আবার নূতন করিয়া সংসারী হইবেন। অনেক খুঁজিয়া একটী দরিদ্র ভদ্রলোকের সুন্দরী কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিলেন। হরিপদের সম্বন্ধ অনেক স্থান হইতে আসিয়াছিল, অনেক স্থানে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও

ছিল, পাত্রীটী ভাল দেখিয়া, কিছু না লইয়াই এই বিবাহ দিলেন। পুত্রবধূটী ছোট, স্নেহ-প্রবণ বৃদ্ধ তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন—সেও শ্বশুরের সহিত কথাবর্ত্তা বলিত; বিশেষ তেমন কিছু লজ্জা করিত না। বৃদ্ধের বড় আশা ছিল, শেষ বয়সে আবার তাঁহার সংসার সুখের হইবে। মানুষ যাহা ভাবে তাহা হয় না। কালীশঙ্কর বসুরও তাহা হইল না। বধূ ক্রমশঃ নিতান্ত মুখরা হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ অন্তরে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার আশা ছিল, বৌমা এখনও ছেলেমানুষ, বয়সে তাহার সব দোষ শুধরাইয়া যাইবে। ক্রমে বধূ অপরাজিতা মাতৃপদে অধিষ্ঠিতা হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। দুইটী সন্তান উপর্য্যুপরি নষ্ট হইবার পর, সন্তোষের জন্ম। 'বৃদ্ধ অতি আদরে পৌত্রটীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত ভালবাসা ক্ষুদ্র শিশুটী অধিকার করিয়া বসিল। বৃদ্ধ সমস্ত সংসারের ভার, সঞ্চিত অর্থাদি সমস্তই পুত্রকে প্রদান করিলেন। পৌত্রটীকে লইয়া বৃদ্ধ প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাহাতেও বাধা পড়িতে লাগিল। সন্তোষ তাঁহার নিকটে আসিলে পত্রবধূ

বিরক্ত হইতেন, কিন্তু বালক তাহা বুঝিত না। সে দিবা-রাত্রি দাদামহাশয়ের কাছে থাকিতে ভালবাসিত। বৃদ্ধ পৌত্রকে মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। হরিপদ তখন উপার্জ্জনক্ষম। কাজেই পিতৃঋণ ক্রমশঃই বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। যুবতী পত্নীর মতের বিরুদ্ধে স্বাধীন ভাবে চলা দিন দিন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

(৩)

সে দিন রথ। সমস্ত দিন বৃষ্টি—সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছিল, গাছের মাথায় অস্ত-মিত-সূর্য্য-কিরণ চিক্ চিক্ করিয়া হাসিতেছিল। সন্তোষ জেদ্ ধরিল সে রথ দেখিতে যাইবে। দাদামহাশয় কি করেন! যত আবদার তাহার দাদামহাশয়ের কাছে। সাটীনের জামাটী ও ফুলওয়ালা টুপিটী সন্তোষকে পরাইয়া দাদামহাশয় তাহাকে রথ দেখাইতে লইয়া গেলেন। রথতলা সেখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে। কতকগুলি কাগজের ফুল, এক পকেট চিনে বাদাম ভাজা,—দুই একটা খাইতে খাইতে দাদামহাশয়ের সহিত সন্তোষ রথ দেখিয়া সন্ধ্যার একটু পরে ফিরিয়া আসিল।

সন্তোষকে রথ দেখিতে লইয়া যাইবার সময় তাহার মাতাকে বলিয়া যাওয়া হয় নাই। ইহাতে অপরাজিতা অত্যন্ত অপমানিতা ও বিরক্ত হইয়াছিল। সবে মাত্র কালীশঙ্কর অন্দরের উঠানে প্রবেশ করিয়া যেমন কোল হইতে সন্তোষকে নামাইয়া দিলেন, অমনি বধূ অপরাজিতা সন্তোষের হাত ধরিয়া বলিলেন, কে তোকে এই বৃষ্টিতে রথ দেখ্‌তে যে'তে বলেছে? যখন জ্বরে ধরবে তখন হবে কি? অপ্রস্তুত হইয়া কালীশঙ্কর বলিলেন, ওর তো দোষ নাই, আমি নিয়ে গিয়েছিলুম, আর বৃষ্টিতো এখন ধ'রে গেছে! গুরুগর্জ্জনে অপরাজিতা বলিল, ধ'রে গিয়েছে বইকি? ও কি? আবার অতগুলি চীনে বাদাম খেয়েছে বুঝি? মেরে ফেল্‌বে দেখছি! বৃদ্ধ আরও অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, না, না, বেশী খায় নাই, দু' একটা খেয়েছে। কুপথ্যি আবার কতগুলো দিতে হয়? তা যা'র যাবে সেই বুঝবে, অন্যের কি? ফেল, নষ্ট ছেলে, শীগ্‌গির সব ফেলে' দে—বলিয়া দ্রুতবেগে সন্তোষের হাত মোচড়াইয়া চীনে বাদামগুলি অপরাজিতা ফেলিয়া দিল। চীনে বাদামের শোকে বালক কাঁদিয়া উঠিল। ছি বৌমা! ছি বৌমা! লাগছে যে! বলিয়া বৃদ্ধ পৌত্রকে নিজের কাছে টানিয়া আনিলেন।

স্বাধীন ইচ্ছায় আঘাত পাইয়া গর্ব্বিতা রমণী শ্বশুরের নিকট হইতে সন্তানকে টানিয়া লইয়া "আর বাইরে যেতে হবে না—ভিতরে চল" বলিয়া জোর করিয়া ঘরের দিকে টানিয়া লইল। বালক ভীতিসূচক দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রন্দনজড়িত স্বরে ডাকিল, "দাদা-মহাশয়!" দুঃখে, অভিমানে, ক্রোধে, শোকে, বৃদ্ধের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। অতি কষ্টে বৃদ্ধ বলিলেন, "যাও দাদা, কি ক'র্‌ব?" এ সমস্ত কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অপরাজিতা সন্তোষকে টানিয়া লইয়া চলিল। নীরবে বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন।

(৪)

স্নান করিবার কিছু পূর্ব্বে, যখন সন্তোষ আসিয়া দাদামহাশয়কে বলিল, দাদামহাশয়, স্নান করিবে না? তখন দাদামহাশয় সুর করিয়া কাশীদাসের মহাভারত পড়িতে ছিলেন। পৌত্রের স্বর কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র, দাদামহাশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আর মহাভারত পড়া হইল না। "হ্যাঁ দাদা, যাই" বলিয়া পৌত্রের সহিত ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন। চাকর তামাক দিয়া

গেল। "আমি ধরাইয়া দিই, আমি ধরাইয়া দিই" বলিয়া কলিকাটী লইয়া টানাটানি করিতে বালক হঠাৎ কলিকাটী ফেলিয়া দিল। ছিট্‌কাইয়া আগুন পড়িয়া সন্তোষের পা ঈষৎ পুড়িয়া গেল। দাদামহাশয় অতি ব্যস্ত হইয়া পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সন্তোষ কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ নানারূপে পৌত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত স্থানে নারিকেল তৈল লাগাইয়া সন্তোষকে বলিলেন, এস দাদা, তোমার ঘুড়ি লাটাই তৈয়ারী করিয়া দিই। উৎসাহে বালকের কান্না থামিয়া গেল। "কই দাও না, দাদা!" বলিয়া পৌত্র দাদা-মহাশয়কে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ কি করেন, একটা সূতা বিহীন কাঠিম লাটায়ে পরিণত করিয়া ঘুড়ি তৈয়ারী করিতে বসিলেন। বালক সতৃষ্ণ নয়নে তাহা দেখিতে লাগিল। ঘুড়ি লাটাই পাইয়া বালক আনন্দে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল, বৃদ্ধ বিষণ্ন মনে স্নান করিতে গেলেন। বালক তাহার ক্ষত-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধ তখন তাহা ভুলিতে পারিলেন না।

(৫)

ইতি মধ্যে সন্তোষের পায়ে আগুন পড়ার

সংবাদ বাড়ীর ভিতর গিয়াছিল। সন্তোষ দাদামহাশয় প্রদত্ত ঘুড়ি লাটাইটী লইয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া মাকে দেখাইয়া বলিল, দেখ দাদা কেমন ঘুড়ি লাটাই দিয়াছে। পুত্রকে দেখিয়া অপরাজিতা গর্জ্জিয়া বলিল, মরনি?—পুড়ে মর্‌লে আপদ্ যেত। ছেলেটাকে পুড়িয়ে মেরে, আবার ঘুড়ি আর লাটাই দিয়ে আদর জানান হ'য়েছে। বলিয়া পুত্রের হস্ত হইতে ঘুড়ি লাটাই কাড়িয়া ফেলিয়া দিল। সন্তোষ ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধ তখন স্নান করিয়া সবে মাত্র বাটী আসিয়াছেন, তখনও সূর্য্যের স্তব পাঠ শেষ হয় নাই। পৌত্রের ক্রন্দন শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া বাড়ির ভিতর গেলেন। পুত্রবধূ তাঁহাকে দেখিয়া যাহা মুখে আসিল তাহা বলিল। প্রহারের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে সন্তোষ বলিল, দাদা! মা আমায় মেরে ফেল্‌লে। তেমনি করুণ-কোমল-ভগ্ন-কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিল, কি করিব দাদা? পাষাণী রমণীর সে কাতর কণ্ঠ হৃদয়ে আঘাত করিল না। হতভাগা ছেলে মর, আমার সুমুখে মর, বেঘোরে আগুনে পুড়ে মর্‌বি কেন? বলিয়া সজোরে পুত্রকে ধাক্কা দিল। সন্তোষ পড়িতে পড়িতে দাদামহাশয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, কিন্তু

বৃদ্ধের আর সহ্য হইল না, দুঃখে ক্রোধে বিরক্ত হইয়া বলিল, বৌমা, যা' খুসি কর, আমি আর এ সব চোখে দেখতে পার্‌বনা। আজই কাশী যাব। বৃদ্ধ নীরবে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। বালক দাদামহাশয়ের সঙ্গে যাইবার চেষ্টা করিল, মাতা হাত ধরিয়া টানিয়া রাখিলেন। ভীত বালক একবার ব্যাকুলভাবে ডাকিল, "দাদামহাশয় !" দাদামহাশয় তখন বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন, বালকের স্বর কাণে গেল না। ক্রোধে অভিমানে বৃদ্ধ নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া পৌত্রের সহিত একবার দেখা করিবার প্রত্যাশায় বাড়ীর ভিতর দিকে চাহিলেন। বালককে তাহার মাতা ধরিয়া রখিয়াছিল, কাজেই তাহার সহিত বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হইল না। বৃদ্ধ বার বার সতৃষ্ণ নয়নে বাটীর ভিতরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। কেহ তাঁহাকে আহার করিতে ডাকিল না। অভুক্ত বৃদ্ধ নিজের বাড়ী হইতে নিজে অনাহারে বিদায় হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধের পুত্র হরিপদ আফিস হইতে আসিয়া নিজের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল পুত্রকে খাটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া অপরাজিতা নিদ্রা যাইতেছেন, বালকও বন্ধন অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া হরিপদ স্ত্রীকে ডাকিলেন, পুত্রের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। পুত্র দাদামহাশয় বলিয়া ছুটীয়া বাহিরে গেল। গৃহিণী অতি-রঞ্জিত করিয়া সেদিনের ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। বুড়ো কবে তামাক খাইতে খাইতে ছেলেকে পুড়াইয়া মারিবে, এ কথাও বলিতে ছাড়িলেন না। হরিপদ পূর্ব্ব হইতেই পুত্রকে অত্যধিক আদর দেওয়ার জন্য পিতার উপর আন্তরিক বিরক্ত ছিল—এ সমস্ত শুনিয়া আরও বিরক্ত হইল।

(৬)

এদিকে বৃদ্ধ বাড়ীর বাহির হইয়া ক্রমাগত পিছনে বাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে যাইতে লাগিলেন, পা আর উঠে না। সন্তোষের সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিয়া বৃদ্ধের যাইতে মন সরিল না। বাড়ীর নিকটেই একটী বট বৃক্ষের তলায় বসিয়া পৌত্রের সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিন যায় না; রৌদ্র পড়িয়া আসিল, কিন্তু সন্তোষ আসিল না। হতাশে বৃদ্ধের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল! ঠিক সেই সময়ে তাহার কাণে গেল, দাদা মশাই! উৎফুল্ল হৃদয়ে গদগদ কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, এই

যে দাদা! মুহূর্ত্ত মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া বালক দাদা-মহাশয়ের হাত ধরিল। বৃদ্ধ সাদরে, দারুণ আবেগে আগ্রহে পৌত্রকে বুকে তুলিয়া লইলেন। পৌত্র বলিল,—দাদামশাই, কোথা যাচ্ছ, আমি যাব। বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, কোথা যাবে দাদা? আমি ঢের দূর যাচ্ছি। সন্তোষ বলিল, না দাদা, আমায় নিয়ে চল। এইখানে মা আমায় মেরে ফেলবে। আমায় বেঁধে রেখেছিল। বৃদ্ধের চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সন্তোষ তাহার ক্ষুদ্র হাত দু'খানি দিয়া দাদামহাশয়ের চোখের জল মুছাইয়া বলিল, দাদামহাশয়, তুমি কেঁদনা, তুমি যেওনা—দাদামশাই তুমি গেলে আমি বাঁচব না। বালকের কথায় বৃদ্ধের অভিমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সস্নেহে বলিল,—না দাদা আমি যাবনা, চল বাড়ী যাই।

(৭)

কালীশঙ্কর চোরের মত নিজের বাটীতে নিজে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল, পুত্র কোনও কথা বলিল না। পৌত্রের মমতায় বৃদ্ধ পুত্রের এই অমানুষিক ব্যবহার নীরবে সহ্য করিলেন। নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বৃদ্ধের দিন কাটিতেছিল। একদিন

সন্ধ্যার সময় সন্তোষ আসিয়া ডাকিল, দাদামশাই, একটা গল্প বলনা? বৃদ্ধ পৌত্রকে নিজের কাছে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, কিরে, তোর গা গরম কেন? জ্বর হ'য়েছে বুঝি?—হ্যাঁ দাদা, মাথা ব্যাথা ক'রছে। তুমি একটা গল্প বলনা, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমাই। বৃদ্ধ নিজের পাশে শোয়াইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে গল্প বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া ডাকিল,—খোকা বাবু প'ড়তে চল—মাষ্টার এসেছে। ব্যাকুলভাবে বালক বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। কালীশঙ্কর বলিলেন—খোকার আজ শরীর খারাপ, প'ড়বে না। মাষ্টারকে যেতে বল। কিছুক্ষণ গল্প শুনিতে শুনিতে বালক ঘুমাইয়া পড়িল, বৃদ্ধ সযত্নে বালককে বুকে করিয়া বাড়ীর ভিতর শোয়াইয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে, বৃদ্ধ যখন দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন ও এক একবার পৌত্রের দর্শন প্রত্যাশায় বাটীর ভিতরের দিকে চাহিতেছিলেন, সেই সময় হরিপদ আসিয়া বলিল, বাবা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, কি কথা বাবা? দাদা ভাল আছে তো? সে কথার কোনও উত্তর না দিয়াই হরিপদ বলিল,—শোন তুমি

আদর দিয়ে দিয়ে খোকার মাথাটা খেলে। তোমার কাছে থাক্‌লে, আর ওর কিছু হবে না। কাজেই ওকে আমাকে আর কোথাও পাঠাতে হবে। বৃদ্ধ অপ্রস্তত হইয়া বলিল, না না ছেলে মানুষ, ওকে আর কোথায় পাঠাবে? আমার তো বয়স হ'য়েছে, আমি না হয় কোথাও তীর্থে চলে' যাই। ছেলে মানুষ, মা বাপ ছাড়া হ'লে ওর বড় কষ্ট হবে। হরিপদ বলিল, সে বেশ কথা—তুমি আজই কাশী রওনা হও। দিন ভাল আছে। পিতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, হরিপদ চাকর ডাকিয়া কর্ত্তার জিনিষ পত্র গুছাইতে আদেশ দিল। এটা ওটা করিতে যাত্রার সময় আসিল—বৃদ্ধ পুত্রকে বলিল, একবার খোকাকে দেখে যাই, কাল জ্বর হ'য়ে ছিল"—বাধা দিয়া হরিপদ বলিল, "না না, এখন আর দেখা ক'রে কি হ'বে? ঘুমুচ্ছে, আর উঠলে কি তোমায় যেতে দেবে? গাড়ীতে উঠবে চল, সময় হ'য়ে এল।" বৃদ্ধ কোনও কথা বলিলেন না। নীরবে পুত্রের সহিত যাইতে যাইতে হঠাৎ যেন বৃদ্ধের কাণে গেল, ক্ষীণকণ্ঠে বালক ডাকিতেছে, "দাদামশাই!" বৃদ্ধ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পুত্র বলিল, "এসনা, দাঁড়ালে কেন?" বৃদ্ধের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পুত্র কিছুই বুঝিল না। এতদিন বৃদ্ধ

নিজের চেষ্টায় যাহা করিতে পারেন নাই, আজ পুত্রের চেষ্টায় তাহা ঘটিল।

(৮)

সেই দিন সন্ধ্যার পর হইতে, সন্তোষের জ্বর বাড়িতে লাগিল, সে চারিদিকে চাহিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিল, "দাদামশাই!" কইতো তাহার দাদামহাশয় "কি দাদা" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন না। বালক কম্পিতকণ্ঠে আবার আরও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "দাদামশাই!" অবোধ বালক জানিত না, তাহার দাদামহাশয় তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। অপরাজিতা বালকের ব্যাকুলভাব দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, বুড়ো ছেলেটাকে কি যাদুই ক'রে গেছে! রাত্রি বারটার পর হইতে সন্তোষের বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। উদাসভাবে বালক বিছানার চাদর আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে, কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "দাদামশাই!" হরিপদ ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তার আসিয়া কোনও আশা দিতে পারিল না। রাশিকৃত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি তখন প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছিল, গৃহকোণের দীপটী তৈল অভাবে ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল, চারিদিকে চাহিয়া

সন্তোষ আকুলকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে প্রাণের আবেগে ডাকিল, "দাদামশাই!" সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই গৃহের দীপটী একবার জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। অপরাজিতা চীৎকার করিয়া সন্তোষের বুকের উপর পড়িল। হায়! তখনও যেন তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, বৃদ্ধ যেন তেমনি করুণ, কোমল ও আকুলকণ্ঠে বলিতেছেন, "কি ক'র্ব দাদা!"



রোগী।

—:—

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বিতলস্থ কোন একটী কক্ষে একটী পরম সুন্দর মুসলমান যুবক অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে। আজ তিন দিবস হইল, একবারও তাহার জ্ঞান হয় নাই। যুবকের সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ—ডাক্তার সাহেব পর্য্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগপূর্ব্বক যুবকের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। নিস্তব্ধ রাত্রি, শীতকাল, ঠাণ্ডা বাতাস—পথ নির্জ্জন, সকলেই সুপ্তিতে মগ্ন। কেবলমাত্র সুশ্রুষাকারিণী একটি খৃষ্টান যুবতী অনিমেষলোচনে পীড়িত যুবকের দিকে চাহিয়া ছিল। যুবতী অনিন্দ্যসুন্দরী। গ্যাসের তীব্র আলোক রোগীর মুখে পড়িয়াছে—বড় বড়

চক্ষু দুইটি মুদ্রিত—যেন অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত—এই গুরুতর ব্যাধিতেও তাহার লাবণ্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। যুবকের বয়স বেশী নয়, ২৪।২৫ বৎসর হইবে। কমলে কৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায় অল্প অল্প শ্মশ্রুরেখায় সেই সুন্দর মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে—অনেকক্ষণ গেল—যুবতী পূর্ব্ববৎ নিশ্চলা, বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। এইবার যুবকের চক্ষু দুইটি অল্প স্পন্দিত হইল। আবার ধীর স্থির,—আবার নড়িল। এইবার যুবক একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া অসহ্য গ্যাসের আলোকে আবার চক্ষু মুদিত করিল। কিছুক্ষণ পরে যুবক আবার চক্ষুরুন্মীলন করিল। এবার আর চক্ষু বুজিল না। ঘরের চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। রজনী তখন গভীর, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ—কেবল অসহ্য যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুমূর্ষু রোগীর অস্ফুট মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাধ্বনি, ক্ষণে ক্ষণে শ্রুত হইতেছিল। যুবক শুশ্রূষাকারিণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথায়? অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অস্ফুটস্বরে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া শুশ্রূষাকারিণী বলিল, ভগবান আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনি উত্তম স্থানে আছেন। যুবক বলিল, আমি কত দিন এ স্থানে আছি?—শুশ্রূষাকারিণী উত্তর করিল, আজ তিন দিন আপনি অজ্ঞান

ছিলেন, এই আপনার প্রথম জ্ঞান হইল। যুবক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা ভীষণ চিন্তার রেখা তাহার সমস্ত বদনমণ্ডলে প্রতিফলিত হইল। যুবক মুহূর্ত্তে তাহা গোপন করিয়া যুবতীর প্রতি কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি বোধহয় দয়াবতী সুশ্রূষাকারিণী? যুবতী ঈষৎ লজ্জিতভাবে উত্তর করিল, আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। যুবক সতৃষ্ণ নয়নে কৃতজ্ঞ স্বরে বলিল, আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন আপনার এ ঋণ আমার চিরদিন মনে থাকিবে। লজ্জিত হইয়া সুশ্রূষাকারিণী উত্তর করিল, আমি সামান্যা সুশ্রূষাকারিণী মাত্র—কর্ত্তব্যের অধিক কিছুই করি নাই। যুবক এতক্ষণ রমণীর মুখখানি অনিমেষলোচনে দেখিতেছিলেন! পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু দু'টি মুদ্রিত করিল। প্রতিধ্বনির মত যুবতীও একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিকটে তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঠং ঠং করিয়া রাত্রি চারিটা বাজিয়া গেল।

(২)

সহরময় হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে—সকলের মুখেই এক

কথা—হাটে, মাঠে, পথে, বাজারে, ষ্টেসনারি, দোকানে সবারই মুখে এক কথা, এক আলোচনা—ট্রামগাড়ীতেও অন্য কোনও গল্প নাই—কেবল ভয়ানক ভয়ানক চুরির গল্প—কলিকাতায় এক অদ্ভুত চোরের আগমন হইয়াছে। পকেটে নোট রাখিয়া দাও, কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, তাহা আর নাই—তুমি কিছুই টের পাইবেনা। যখন তুমি নোট বাহির করিবে, দেখিবে নোটগুলি সামান্য সাদা কাগজে পরিণত হইয়াছে। টাকার তোড়া লইয়া যাইতেছ—বাড়ী গিয়া দেখিবে পয়সার তোড়া হইয়া গিয়াছে। এ আজব সহরে সবই আজব! ট্রেনে তুমি বাড়ী যাইবার জন্য উঠিলে, দুই একটা ষ্টেশন পরেই আর একটী ভদ্রলোক সেই গাড়ীতে উঠিলেন—দিব্য পোষাকপরিচ্ছদ—ডাক্তার, কন্‌ট্রাক্টর, প্রফেসর, মার্চ্চেণ্ট বা কোন উকীল বলিয়া আত্ম পরিচয় দিলেন। তোমার কেমন একটু নিদ্রা পাইল, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার ঝাঁকিতে তোমার তন্দ্রা ছুটীয়া গেল—দেখিলে সে ভদ্রলোকটী নাই—তোমার মনে কোনও সন্দেহই নাই, হঠাৎ ঘড়িটী দেখিবার প্রয়োজন হইল, যাহা দেখিলে স্বপ্ন কি জাগ্রত বুঝিতে পারিলে না—ঘড়ি, চেইন ইত্যাদি সবই আছে—তবে তোমার যেটী ছিল,

সেটী নাই—সোনার চেইনের পরিবর্ত্তে ষ্টীলের চেইন হইয়াছে—বহুমূল্য স্বর্ণ ঘড়ির পরিবর্ত্তে একটী "ক্রুক-ডাইজার" টিক্ টিক্ করিতেছে। অদ্ভুত ব্যাপার—অথচ সেই চোরের কোনও সন্ধান হইতেছে না। সহর জুড়িয়া লোকের ভয়, যে এত বড় ক্ষমতাবান—সে হয়ত কবে তাহাদের দেহটা বেমালুম চুরি করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটা নূতন দেহ রাখিয়া যাইবে!

(৩)

চৌরঙ্গীর কোন একটী সাহেবপল্লীতে সেই সুশ্রুষা-কারিণী যুবতী একটী ছোট বাড়ীতে বাস করেন। যুবতী কুমারী, কেহই নাই—তবে তাহার খুড়তুতো ভাই অ্যারাটুন তাহার পাণিপ্রার্থী—প্রত্যহ সে দেখা করিতে আসে—কিন্তু যুবতী তাহাকে কেন জানি না,—এ পর্য্যন্ত ভালবাসিতে পারে নাই। অ্যারাটুন ভালবাসার কথা বলে,—যুবতী তাহার কোনই উত্তর দেয় না—অথচ দুই জনে বেশ হাসিয়া খেলিয়া কথা কয়; অ্যারাটুন যুবতীর হৃদয় ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তখন প্রায় সন্ধ্যা—আকাশের রং প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইতেছিল; অস্তগত সূর্য্যের রক্তিমাভা তখনও গগণপ্রান্ত হইতে

বিলাস নাই। সুনীল গগণের কোন প্রান্তে জ্যোতিঃহীন দু' একটা নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল—যুবতী তাহার বড় আদরের বারান্দায় সজ্জিত টবগুলিতে জল দিতেছিল। এমন সময় অ্যারাটুন আসিয়া ডাকিল, "ক্লারা"! যুবতী মুখ ফিরাইয়া বলিল,—কে—অ্যারাটুন? এস ভাই, ব'স। অ্যারাটুন বলিল, আজ আর আমার বসিবার অবসর নাই, নিতান্ত তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না—তাই আসিয়াছি। অ্যারাটুন পুলিসের ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কার্য্য করিত। তাই ক্লারা হাসিয়া বলিল, আজ আবার কাহার আলিপুরে বাসস্থান স্থির করিয়া দিবে মনে করিয়াছ? অ্যারাটুন বলিল, সে সুবিধা বড় নাই,—আমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছি সে বড় চতুর লোক। তোমার নিকট বোধ হয় গল্প করি নাই—এই চতুরকে আমি জীবনে একবার দেখিয়াছিলাম—সে যেরূপ চতুরতায় আমার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা তুমি শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে—আমি বোম্বে মেলে বিশেষ কার্য্যানুরোধে যাইতেছিলাম। আমাদের বোম্বে মেলের পার্শ্ব দিয়া যখন পঞ্জাব মেল অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল, তখন রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল চলন্ত পঞ্জাব মেল হইতে চকিতের মত কে

একজন আমাদের চলন্ত গাড়ীর পা দানের উপর লাফা-ইয়া পড়িল। আমি সেই মুহূর্ত্তেই দেখিলাম, লোকটী ছায়ার মত নিঃশব্দে একটী দ্বিতীয় শ্রেণী গাড়ীর দরজা খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পরের ষ্টেশনে আমি গাড়িখানি লক্ষ্য করিয়া যাইয়া দেখিলাম, একটী সুশ্রী যুবক সেই গাড়ীতে বসিয়া একখানি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন। আমি বিস্মিত হইলাম! এরূপ লোক যে চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারে, আমি তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না। তথাপি মনের সন্দেহ অপনোদনের জন্য তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। দ্বিতীয় ষ্টেশনে আমি আমার জিনিষ পত্র লইয়া সেই কামরায় প্রবেশ করিলাম, তখনও যুবক নিবিষ্ট চিত্তে সংবাদপত্র পাঠ করিতে ছিলেন। আমি বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া নিদ্রার ভান করিয়া রহিলাম। যুবকের অলক্ষ্যে দুই একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম—ভাল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি স্থির করিলাম, ষ্টেশনে টিকিট পরীক্ষা হইবে —তখনই আমার অনুমান সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিব এবং সেইরূপ ব্যবস্থা করিব। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। একজন ইংরেজ আরোহী উঠিলেন; দেখিলাম লোকটী যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে সেইরূপ

মাংসপেশী দৃঢ় ও সবল—দেখিলেই খুব বলবান লোক বলিয়া মনে হয়—ইংরেজটী এক পাশে বসিয়া সংবাদ পত্র পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবক অতি সুন্দর ইংরেজীতে সাহেবটিকে বলিলেন, মহাশয়, সংবাদ পত্র পরিবর্ত্তন করিতে আপত্তি আছে কি? সাহেবটী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কিছু মাত্র না। ধন্যবাদ দিয়া যুবক সংবাদপত্র বিনিময় করিলেন। শক্তিশালী ব্যক্তি মাত্রেই সাধারণতঃ সরল চিত্ত হয়। দেখিলাম সাহেবটী সরল ও ভদ্র; নতুবা অপরিচিতের এই অনুরোধ তিনি রক্ষা করিতেন কিনা সন্দেহ। কিছুক্ষণ পরেই সাহেবটী বিস্মিতনেত্রে যুবকটীর প্রতি চাহিলেন, যুবকটীও সাহেবের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিলেন। আমি ব্যাপার কিছুই বুঝিলাম না। মুহূর্ত্ত মধ্যে যুবক শিকারের প্রতি ব্যাঘ্রের মত আমার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ভদ্রলোকটীও আমাকে আক্রমণ করিলেন। আমি তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম—কিন্তু ইংরেজটীর গায়ে অসীম শক্তি—আমি ঘণ্টা বাজাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহারা আমাকে জোর করিয়া গাড়ীর মেজেয় ফেলিয়া দিল। আমি চীৎকার করিব মনে করিলাম, যুবক আমার ভাব বুঝিতে

পারিয়াই আমার নাক ও মুখের উপর একখানি রুমাল চাপিয়া ধরিল। রুমালের তীব্র গন্ধে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। যখন আমার জ্ঞান হইল তখন দেখি—আমি ওয়েটিং রুমে রহিয়াছি। অনেকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারী সেই ইংরেজটীকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে যুবক পলায়ন করিয়াছে? পুলিশ কর্ম্মচারীরা আমাকে আনুপুর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিল। যে সংবাদপত্রখানি ইংরেজের সহিত পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহার এক পার্শ্বে পেন্‌সিলে লেখা ছিল—"আমি ডিটেক্‌টিভ, এই লোকটী খুনী আসামী, আমি ইহাকে গ্রেপ্তার করিব, আপনার সাহায্য প্রার্থী।" যুবকের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইংরাজ ভদ্র লোকটী সাহায্য করে। আমি বন্দী হইবার পর, গাড়ী ষ্টেশনে আসিলেই আমায় ইংরেজ ভদ্রলোকটীর জিম্মায় রাখিয়া সে পুলিশ ডাকিতে যায়—আর ফিরে নাই। আমি তাহার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করিলাম। আমার কিছু চুরি গিয়াছে কিনা, জানিবার জন্য পকেট পরীক্ষা করিয়া দেখি, একখানি কার্ড রহিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে—"মীর্জ্জা রহমান"। নামটী আমার মুখ হইতে অস্ফুট উচ্চারণ হইতেই

ইংরাজ ভদ্রলোকটী লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—কি সর্ব্বনাশ! আমি সে ভয়ঙ্কর চোরের সাহায্য করিয়াছি? এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার কেহই অনুমান করেন নাই—পুলিশ কর্ম্মচারী সকলেই বিস্মিত হইলেন। কি ভয়ানক লোককে হাতে পাইয়া ধরিতে পারিলাম না ভাবিয়া আমিও বড় অনুতপ্ত হইলাম। যাহা হউক যাহার জুয়াচুরীর অদ্ভুতত্ব দর্শনে সমস্ত ভারতবর্ষীয় পুলিশ মুগ্ধ—আমি সেই চতুরকে এইবার ধরিব। ক্লারা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিল,—তুমি ধরিবে? এত বড় বড় ডিটেক্‌টিভ যাহাকে ধরিতে পারিলেন না, তুমি তাহার কি করিবে? এরাটুন একটু কঠোর হাসি হাসিয়া বলিল, আমার কৃতিত্বে তুমি চির দিন অবিশ্বাসিনী। ভাল—আমি তোমায় বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি না; কিন্তু আমার এমন দিন আসিবে, যেঁদিন নিশ্চয়ই আমার কৃতিত্ব তোমাকে মুগ্ধ না করিয়া পারিবে না। ক্লারা কিছুই বলিল না, বিস্মিত নেত্রে এরাটুনের মুখ পানে চাহিল। এরাটুন "শুভ রজনী" বলিয়া বিদায় হইল।

(৪)

প্রাতঃকাল—মেডিকেল কলেজের বারাণ্ডায় রৌদ্র

আসিয়াছে। শীতের রৌদ্র—বড়ই প্রিয়—অনেক রোগী বারাণ্ডায় বসিয়া রৌদ্র উপভোগ করিতেছিল—বারাণ্ডায় এক পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান, সেই, যুবক ক্লারার সহিত দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল,—ক্লারা বলিল, লতিফ! একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—বড়ই সুসংবাদ! যে ভয়ঙ্কর চোরের গল্প তোমার নিকট বলিয়াছিলাম, আমার ভাই এরাটুন আজ রাত্রি ১২টার সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। তাচ্ছিল্যের ভাবে লতিফ্ বলিল, তুমি এ সংবাদ জানিলে কি প্রকারে? ক্লারা একটু হাসিয়া বলিল, সে একটু অদ্ভুত রকমের। কাল আমি ডিউটী করিয়া রাত্রে বাড়ী গিয়া দেখি—আমার ভাই এরাটুন—আমার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া চেয়ারের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল এক টুক্‌রা কাগজের উপর লেখা আছে—“কল্য রাত্রি ১২টার সময় ইন্‌স্পেক্টর যেন কুড়ি জন কনষ্টেবল লইয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখে ছদ্মবেশে অপেক্ষা করেন।” যদিও সে আমার কাছে কিছু প্রকাশ করে নাই, আমিও তাহার কাছে কোনও কথা প্রকাশ করি নাই, তবে আমার ধারণা নিশ্চয়ই কিছু সন্ধান পাইয়াছে। ভগবান করুন যদি সে এই চোরকে ধরিয়া গবর্ণমেন্টের প্রশংসা-

ভাজন হয়, তাহাতে আমার আনন্দই হইবে। ভাবে বোধ হইল লতিফ্ এ কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিল না বা শুনিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। তবে ক্লারাকে বলিল,—দেখ ক্লারা, কাল আমি রাত্রে দেশ হইতে সংবাদ পাইয়াছি—আমার প্রজারা সব বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে আমার সেখানে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আর আমি অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না—অথচ তোমাকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, আমি তোমাকে ততোধিক ভালবাসি। তাই বলিতেছি—ক্লারা আজ আমরা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তোমাকে পত্নীরূপে লইয়া দেশে যাই। মুহূর্ত্ত দেরী আমার একটী যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে। ক্লারা কোনই আপত্তি করিল না। বলিল—তোমার যাহাতে সুবিধা, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। বলা বাহুল্য ক্লারার অভিভাবক কেহই ছিল না—সে নিজেই তাহার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সেই দিনই নিকটস্থ কোনও একটী ছোট গির্জ্জায় ক্লারা ও লতিফের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

(৫)

গভীর রাত্রি—ঢং ঢং করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে ১২টা বাজিয়া গেল। এরাটুন কলেজের চতুষ্পার্শ্বে পুলিশগুলিকে লুকাইত রাখিয়া কলেজের উপরে উঠিয়া গেল। যে ঘরে লতিফ্ ছিল, সেই ঘরের সেই খাটিয়া শূন্য—ব্যস্ত হইয়া এরাটুন, সুশ্রূষাকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, ৮ নং রোগী কোথায়? সুশ্রূষাকারিণী যাহা উত্তর দিল, তাহাতে এরাটুনের মস্তক ঘুরিয়া গেল—সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। সুশ্রূষাকারিণীর সম্মুখের চেয়ারে বিনা অনুমতিতেই বসিয়া পড়িল। সুশ্রূষাকারিণী বলিলেন, আপনি অমন করিতেছেন কেন? রোগী দিব্য সুস্থ হইয়া ডাক্তারের অনুমতি লইয়া হাঁসপাতাল ত্যাগ করিয়াছেন। এরাটুন নিরাশ-ব্যঞ্জক স্বরে সুশ্রূষাকারিণীকে বলিল, আমি ব্যস্ত হইতেছি কেন শুনিবেন? সে রোগী কে জানেন? সুশ্রূষাকারিণী উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? এরাটুন উত্তেজিত স্বরে বলিল, এই সেই কলিকাতার বিখ্যাত ভদ্রলোক বেশী যাদুকর জুয়াচোর "মির্জ্জা রহমান"। সুশ্রূষাকারিণী বাত্যাহত কদলী বৃক্ষবৎ ভয়ে থর থর

করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এরাটুন বলিল, পাজি পলাইয়াছে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প। সে অতি চতুর, পুলিশ বিভাগের আমি ছাড়া আর কেহই তাহাকে প্রত্যক্ষ করে নাই। আমি ছাড়া তাহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এই বলিয়া ব্যস্তভাবে এরাটুন কলেজের ফটকের বাহিরে আসিয়া পুলিশদিগকে সেদিনকার মত বিদায় দিয়া দ্রুতপদে ক্লারার বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল। নিস্তব্ধ পল্লী—কেহই জাগ্রত নাই। এরাটুন ক্লারার শয়ন কক্ষ অন্ধকার দেখিল—ভাবিল, হয়ত ক্লারা ঘুমাইয়াছে। নিঃশব্দে প্রবেশ দ্বার ঠেলিল, দ্বার খুলিয়া গেল। এরাটুন ব্যস্তভাবে ডাকিল "ক্লারা!" কেহই উত্তর দিল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এরাটুনের মস্তকে কে যেন গুরুতর আঘাত করিল। সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

(৬)

গাছের পাশে গাছ—অন্ধকারের কোলে অন্ধকার—নির্জ্জনতার সহিত নির্জ্জনতা মিলিত হইয়া সুন্দরবনকে অতি ভয়ানক স্থান করিয়া তুলিয়াছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া ভিতর দিয়া মেখলার মত সুন্দরবনকে বেষ্টন করিয়া

নদীটী বহিতেছিল—তাহার নিকটেই গভীরতর জঙ্গলের ভিতর একখানি বাড়ী। বাড়ীখানি বৃহৎ নয় কিন্তু দৃঢ়। ভিতরে অনেকগুলি কক্ষ, নিম্নতলে জানালা নাই—উপরের ঘরগুলিতে দৃঢ় লোহার শিক্‌মণ্ডিত জানালা। তাহারই একটী সজ্জিত কক্ষে, একটী যুবক অন্যমনে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। যুবকের মুখ দেখিলেই বোধ হয়—সে যেন কি এক ভীষণ কল্পনাময় চিন্তা-স্রোতে নিমগ্ন। অনেক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে যুবক বলিল, এ সব আমি ত্যাগ করিব—ক্লারা তুমিই আমার ধ্যান জ্ঞান। আজ হইতে আমার জীবন অন্য পথে চালিত হইবে। তোমাকে লইয়া সৎপথে জীবন যাপন করিব। এ সংসারে যাহারা আমার চরিত্র ও কার্য্য প্রকৃতরূপে অবগত—তাহাদের স্মৃতি হইতে আমাকে আমি চিরদিনের জন্য দূরে রাখিব। পাপলব্ধ অর্থ যথেষ্ঠ করিয়াছি। তাহার এক কপর্দ্দকও আমার প্রয়োজন নাই। তাহাদের সমাধি আমার গত কৃত কর্ম্মের সহিত, এইখানেই চিরদিনের জন্য হইবে। এমন সময় দ্বার খুলিবার ঘণ্টার শব্দ হইল, দরজা খুলিয়া একটী লোক প্রবেশ করিল। লতিফ্ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এরাটুনের কি হইল? লোকটী বলিল, আপনার

আদেশমত তাহাকে নীচের কয়েদ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। লতিফ্ উল্লাসিত হইয়া বলিল, তোমার উপর বড় খুসী হইলাম। আমার প্রত্যেক লোককে এইখানে আজ এই সময় উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই উপস্থিত আছে? লোকটী বলিল, আমাদের দলের একটী বালক পর্য্যন্ত আজ এ বাটীতে অনুপস্থিত নাই। সকলেই আপনার জন্য নীরবে হলঘরে অপেক্ষা করিতেছে। লতিফ্ বলিল,—উত্তম, আমার অনুমতি ব্যতীত কেহ যেন বাহিরে না যায়। অভিবাদন করিয়া লোকটী চলিয়া গেল।

(৭)

সপ্তমীর চন্দ্র; কৃষ্ণ মেঘের ভিতর গাছের আড়ালে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। নদী কুলকুল করিয়া বহিয়া যাইতেছিল—সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ—একটী পাতা পর্য্যন্তও নড়িতেছিল না। এমন সময় ধীরে ধীরে একটী যুবক, অতি সন্তর্পণে বাড়ীটার চারি কোণে কি যেন পুতিয়া দিল—তাহার পর একবার বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল—তখন যুবকের চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতেছিল। একটী হৃদয় বিদারক নিশ্বাসের সহিত

যুবক অস্ফুট স্বরে বলিল, এ সংসারে যাহারা আমার বড় আদরের, বড় প্রিয়, আমি স্বহস্তে তাহাদের মূল্যবান জীবন বিসর্জ্জন দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দিয়াশলাই দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রোথিত দ্রব্যের সংযোজিত পলিতায় আগুন ধরাইয়া ছুটীয়া নদী কিনারায় আসিল। নদীতীরে ছোট একখানা নৌকা বাঁধাছিল—নৌকায় একটী যুবতী উৎকণ্ঠিতনেত্রে বনপথের দিকে চাহিয়াছিল। যুবতীর উন্মুক্ত কেশরাশি চঞ্চল বায়ু হিল্লোলে দুলিতেছিল। অল্প অল্প চন্দ্রালোক বৃক্ষান্তরাল হইতে যুবতীর মুখে পড়িতেছিল—জলেও রজত রেখার মত দুই তিনটী রেখা পড়িয়া নদীর তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। এমন সময় যুবক ডাকিল "ক্লারা!"—যুবতী দৌড়িয়া যুবকের গলা ধরিয়া বলিল,—"লতিফ্!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দুম্ করিয়া একটী ভয়ানক শব্দের সহিত ডিনামাইট প্রভাবে লতিফের দল বল লইয়া সেইখানে সেই বৃহৎ বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়া গেল। প্রেমের জয় হইল, লতিফের নৌকাও স্রোতবেগে ভাসিয়া চলিল।



সহধর্ম্মিনী।

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতকালের প্রভাত; অত্যন্ত বাতাস বহিতেছিল—শীতল বাতাস যেন হাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত উষ্ণ রক্ত শীতল করিয়া দিতেছিল। দু' এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতেছিল। "সাঁওতাল পরগণার উপত্যকাতলবাহিনী দারা নদী মন্থর" প্রবাহে বালুকাকীর্ণ পথ বহিয়া যাইতেছিল। কুয়াশার মধ্য দিয়া ভেলু গ্রামবাসিগণের পর্ণকুটীরগুলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। নদীতটে একখানি ছোট ডিঙ্গা বাঁধা। নৌকাখানি অতি জীর্ণ—তীরে দাঁড়াইয়া ভেলুগ্রামের ভীল জাতীয় বৃদ্ধ মালাই সর্দ্দার তাহার পুত্র কালুকে বলিল, কালু তুই

এ সময় পারে যাস্‌নি—কখন জমিদার তলপ দেবে, তারতো কিছুই ঠিকানা নাই—তুই আজ ঘর ছেড়ে যাস্‌নি। গলায় বিচিত্র কড়ির মালা, পরিধানে মোটা সূতার মলিন বস্ত্র, মাথায় ঝুঁটি, তাহাতে কতকগুলি পাখীর পালক গোঁজা—কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ যুবক, করধৃত ধনুক অবনত করিয়া বলিল, কেন বাপি তুই ভাবছিস্‌? তুই ভেরীর আওয়াজ দিলেই হামি অমনি চলিয়া আসিব। ওপারে একটা বড় শের বেরিয়েছে, মেরে আসিব। জানিস্‌তো ভালু গিরামের লোকেরা একেত্তো ক'রে হামাকে ডেকে পেঠিয়েছে—হামি না গেলে তাদের শিকার হোবে না। হামি না গেলে তারা কি ভাববে? কিছুক্ষণ ভাবিয়া বৃদ্ধ মালাই সর্দার বলিল, তা তুই যা—গিরামের ঢের গরু বাছুর মেরেছে—কিন্তু ভেরীর আওয়াজ শুন্‌লেই আস্‌বি—তুইতো শুনেছিস্‌ হামাদের জমিদারের সাথে আর একটা জমিদারের লড়াই বেঁধেছে, বদ্‌মাস্‌রা জমিদারের ঘরবাড়ী লুট করিবার মতলবে আছে—শুন্‌ছি জেনানাদের বেইজ্জৎ ক'রবে। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ঝালু সদম্ভে বলিল, হামাদের জান্‌ থাক্‌তে জমিদারের জেনানাদের বেইজ্জুৎ করবে? তাহার সবল মাংস পেশীর সমস্ত শিরাগুলি স্ফীত হইয়া

উঠিল। মালাই সর্দ্দার বলিল, হামি তাই তোকে যেতে বারণ করছিল—বাপি! তুই কিছু ভাবিস্‌নি! হামার জান্‌ থাকতে জমিদার বেইজ্জৎ হোবে না। তুই যেমন ভেরী বাজাবি, হামি অমনি আসবো। পুত্রের গৌরবপূর্ণ বীরত্বভাবোদ্দীপক মুখচ্ছবি দেখিয়া পুত্রবৎসল বৃদ্ধ অন্তরে অতিশয় প্রীত হইল। স্নেহ কোমল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঝালু—হামি তা জানি—তুই আমার বেটা—কালী মা তোর ভাল কর্ব্বে।" বৃদ্ধ চলিয়া গেল। ঝালু লাফাইয়া উঠিয়া নৌকা খুলিয়া দিল—ক্ষুদ্র তরণী দারার তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া চলিল।

(২)

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল—কুয়াশাও কাটিয়া গেল—ক্ষীণ দিবালোকে প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। নৌকা হইতে ভেলু গ্রামের বৃক্ষসমাকীর্ণ কুটীরগুলি দেখিয়া ঝালুর হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল। সে দ্বিগুণ বলে নৌকা চালনা করিতে লাগিল। পরপারে নির্জ্জন ঘাটে একটী ভীল যুবতী সতৃষ্ণ নেত্রে ঝালুর নৌকার দিকে চাহিয়াছিল। ঝালু সেই দিকে দৃষ্টিপাত

করিল। তাহার বুকের ভিতর যেন নাচিয়া উঠিল। উল্লাসরাশি তাহার চোকের কোল দিয়া মুখময় ছড়াইয়া পড়িল। যুবতীর হৃদয়ে যে কত আনন্দ তাহা সে ভাষায় প্রকাশ করিতে জানে না। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য প্রতি-ফলিত মুখচ্ছবিতে তাহা দিব্য প্রকাশ পাইতেছিল। যুবক আরও জোরে দাঁড় টানিয়া সত্বর নৌকা কূলে ভিড়াইল। যুবতী ছুটিয়া আসিয়া নৌকাপূরোলগ্ন বন্ধন রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরিল। স্রোতে অনিচ্ছাস্বত্বেও নৌকাখানির মুখ যুবতীর সুগঠিত পদতল স্পর্শ করিল। যুবক লাফাইয়া তীরে নামিয়া যুবতীকে দৃঢ় আলিঙ্গন পাশেবদ্ধ করিয়া কোমল মধুর হৃদয়স্পর্শী স্বরে বলিল—বিজলী তুই এসেছিস্। লজ্জা আসিয়া যুবতীর মুখ অবনত করিয়া দিল। বিজলীর সহিত অল্পদিন হইল ঝালুর বিবাহ হইয়াছিল। তখনও বেলা অধিক হয় নাই। প্রভাতে সূর্য্যের স্নিগ্ধ করস্পর্শে বৃক্ষগুলির জড়তা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছিল। অদূরে বনমধ্য হইতে ঘুঘুর প্রণয়ণীর প্রতি কোমল প্রেম সম্ভাষণ শুনা যাইতেছিল—থাকিয়া থাকিয়া ঝোপের আড়াল হইতে শ্যামা শিস্ দিতেছিল। বাতাসের শৈত্য তখন অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। মৌয়া ফুলের উগ্র মিষ্ট গন্ধ বাতাসে মিশিয়া একটা নেশার মত উৎফুল্ল করিতেছিল।

দুইজনে নৌকাখানি চড়ার উপর টানিয়া তুলিয়া ভীল-দম্পতী নিকটবর্ত্তী কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল।

(৩)

বিজলীর পিতার বাটীর প্রাঙ্গণে একটা শিরীষ গাছের তলায় ভীল যুবকেরা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া ঝালুর আগমন প্রতীক্ষায় তাহার চারিদিকে বসিয়াছিল। পর্ণকুটীর কয়েকখানি মাটীর দেওয়ালে ঘেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অঙ্গন গোময় লিপ্ত খট্ খট্ করিতেছিল, একটী সূঁচ পড়িলে, পাওয়া যায়। চারি পাশে আম, জাম ও পেয়ারার কয়েকটী গাছ, কিছু দূরে সবুজ কলাইয়ের ক্ষেত্র। বহিরঙ্গণে দুইটা বলিষ্ঠ মহিষ বাঁধা—সমস্ত গৃহস্থালী যেন বেশ শ্রীসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণে ঝালু ও বিজলী প্রবেশ করিল। ঝালুকে দেখিয়া ভীল যুবকেরা যুগপৎ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল; আনন্দ গর্ব্বে ঝালুর মুখ রক্তিমাভা ধারণ করিল। তার পর সকলে অতি সত্বর ঢাক, ঢোল, মাদল, কাড়া বাজাইয়া বর্শা, তীর, ধনুক ইত্যাদি লইয়া ব্যাঘ্র শিকারে বাহির হইল। গাছের পর গাছ শালবন, মাঝে মাঝে বাজরার ক্ষেত, তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে মানুষ দেখা যায় না, উঁচু নিচু বন্ধুর ভুমি—সকলে চীৎকার করিয়া ঢোল

বাজাইয়া শীকার সন্ধান করিতে লাগিল। দুই একটী বন্য বরাহ ও শশক প্রভৃতি শিকারীদের তীক্ষ্ণ বাণে ইহলোক ত্যাগ করিয়া শিকারীদের হৃদয়ে পৈশাচিক হর্ষ সঞ্চার করিল। অনেকক্ষণ পরে একটি উলুবনের ঝোপের মাথা ঈষৎ নড়িতেছে দেখা গেল। শিকারীরা 'ঐ বাঘ' 'ঐ যে বাঘ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জ্জন শোনা মাত্রেই অমানুষিক সাহসে ঝালু অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহার তীক্ষ্ণ বর্ষা স্থির করিয়া ধরিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাঘ্র ঝালুকে লক্ষ করিয়া বর্ষার উপর লাফাইয়া পাড়ল। বর্ষা বিদ্ধ ব্যাঘ্রের অন্তিম আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই জয়োৎফুল্ল বিরাট ভীলের দল ঝালুকে "বাহবা' দিয়া শতাধিক বর্ষা—পতিত ব্যাঘ্রের দেহে নিক্ষেপ করিল। প্রিয়তমের বিজয় উল্লাসে উল্লাসিত বিজলী ছুটিয়া গিয়া ঝালুর হস্ত ধরিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সমস্ত আনন্দ চকিতের মত মিশাইয়া গেল। ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, ব্যাঘ্রের ভীষণ—নখাঘাতে ঝালুর বামহস্তটি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। জয়লব্ধ ভীলযুবক ঝালুর সেদিকে কোন দৃষ্টিই ছিল না।

(৪)

বাড়ীতে আসিয়াই বিজলী তাহার স্বামীর ক্ষতস্থানে

কতকগুলি বন্য লতার রস করিয়া বাঁধিয়া দিল। তখন বাহিরে একটা বিরাট ভোজের আয়োজন হইতেছিল। বন্যশূকরের দেহ অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতেছিল—আজ বিজলীর বড় আনন্দ সে হাসিয়া হাসিয়া প্রাঙ্গণময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। কখনও বা ঝালুর কাছে গিয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল। ইহার মধ্যে শতাধিকবার ঝালুর ক্ষত কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। বন্য মধুপজাত তীব্রসুরা পান করিয়া কেহ মাদোল বাজাইতেছিল, কেহ বা গান গাইতেছিল, কেহ বা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে বাঁশীর তালে তালে নাচিতেছিল। সকলেই আজ আনন্দে বিহ্বল। সে বিরাট ভোজে বনবাসী ভীলেরা যেমন সরল নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, আমাদের কোন সভ্য সম্প্রদায় বিপুল অর্থব্যয়ে সেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, একটিও গাছের পাতা নড়িতেছিল না—প্রকৃতি স্থির গম্ভীর ভীষণ ভাবময়ী, দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড় ও জল; সেরূপ দারুণ বর্ষণ বহুদিন ভেলু-গ্রামবাসীরা দেখে নাই। মুহুর্মুহু অশনিপাত শব্দ সেই দারুণ ঝড়ের মধ্যে মিলিত হইয়া ভীষণ দানবের মত থাকিয়া থাকিয়া হুহুঙ্কার করিতেছিল। প্রবল ঝটিকার

শিথিল মূল বৃক্ষ সকল ভূপতিত হইতে লাগিল। কাহারও ঘর পড়িয়া গেল, কাহারও চাল উড়িয়া গেল, বাহিরে বাঁধা মহিষেরা দড়ি ছিঁড়িয়া ভীতিব্যঞ্জক শব্দ করিতে করিতে লাঙ্গুল তুলিয়া সচল মেঘখণ্ডের মত সেই অন্ধকারে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সমস্ত গ্রামবাসীর একটা বিকট ভীত রোল সমুত্থিত হইল। এমন সময় পরপারের ভেলু-গ্রাম হইতে মুহু মুহু ভেরীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সে ধ্বনি ঝালুর কর্ণে যাওয়ামাত্র তাহার মৌয়া মদের নেশা কাটিয়া গেল। ঝালু বস্ত্র সংবৃত করিয়া বর্ষাটী হাতে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে সেই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে নদীতট লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। কেহ তাহা দেখিয়াও দেখিল না। দেখিল একজন—সেও নিঃশব্দে একটী বর্ষা লইয়া ঝালুর অনুসরণ করিল।

(৫)

মৃত্যুর ছায়ার মত সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার সমুদ্র ভেদ করিয়া ত্বরিতপদে ঝালু নদী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিকে তাহার ক্ষুদ্র নৌকাখানি সন্ধান করিল, পাইল না। যেখানে নৌকাখানি বাঁধা ছিল, সেখানে অগাধজল, ভীষণ স্রোত উভয়কূল ভাসাইয়া দারানদী প্রায় দ্বাদশগুণ আয়তন ধারণ করিয়াছে। ঝালু বুঝিল,

পার্ব্বতীয় নদীর বিপুল স্রোত বৃদ্ধির জন্যই তাহার নৌকা-খানি অন্তর্হিত হইয়াছে, আর পাইবার আশা নাই। তখন সে নিরাশ প্রাণে, নিঃস্পন্দদেহে আকাশের দিকে হতাশভাবে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল অন্ধকারের পর অন্ধকার! সম্মুখে ভীষণ খরস্রোতাদারা নদী, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, অগাধ শালবন, উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, শালবন বাত্যা-বিক্রম-মিশ্রিত বজ্রনাদ। সেই অন্ধকারে নদীর কি বিশাল আস্ফালন। উত্তাল-তরঙ্গমালা যেন লক্ষ লক্ষ উর্দ্ধফণ অজগরের মত মূহুর্মূহু ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। আবার ভেরী বাজিয়া উঠিল, সমস্ত দেহের উষ্ণ রক্ত এক সঙ্গে ঝালুর মস্তকে প্রবেশ করিল। তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী অন্ধকারে নক্ষত্রের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, প্রাতঃকালে সে পিতৃসকাশে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, ভেরীর শব্দ শোনামাত্র সে পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। হায়! বুঝি আজ তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার বাম হস্ত ভগ্ন, এই ভীষণ তরঙ্গ ঠেলিয়া পরপারে জীবিত অবস্থায় যাওয়া মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। ঝালুর শিরায় শিরায় তড়িৎ ছুটিতেছিল, সে উন্মত্তের মত সমস্ত নদী-তীর অনুসন্ধান করিল; অবলম্বনের কিছুই পাইল না।

বাহিরে ভীষণ ঝড় ভীল-যুবকের অন্তরে তাহা অপেক্ষা অধিক ঝড় বহিতেছিল ; উন্মত্ত ভীল-যুবক দুই হস্ত যুক্ত করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ভক্তিভরে প্রাণের আবেগে ডাকিল—হে কালি মায়ি ! হামায় ওপারে পাঠিয়ে দে। ঠিক সেই সময়ে কে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। চমকিত হইয়া ঝালু পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—বিজলী। বিজলী সাগ্রহে বলিল,—"ঝালু" তুই না ব'লে চলে এলি কেন ? ভীলযুবক সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার বলিল। বিজলী স্থিরভাবে সমস্ত শুনিয়া দৃঢ়ভাবে বলিল, "তুই ভাবছিস্ কেন ঝালু ? হামি তোকে পারে লিয়ে যাব। বিস্মিত হইয়া ভীলযুবক যুবতীর মুখের দিকে চাহিল—বিদ্যুতালোকে দেখিল, যুবতীর মুখে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ—দৃঢ়তা ও কোমলতার অপূর্ব্ব সম্মিলন। ঝালু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, তুই ব'লছিস্ কি ? হামার হাত ভাঙ্গা, তুই আমাকে কেমনে পারে লিয়ে যাবি ? যুবতী দৃঢ়স্বরে বলিল—হাঁ লিয়ে যাব, রাজাকে বাঁচাতে জান দিলে যে পুণ্য আছে আমি তোকে সে পুণ্য লিতে দিব। ঠিক সেই সময়ে আবার ভেরী বাজিয়া উঠিল—সে স্বরে বিচলিত হইয়া বিজলী উত্তেজিত কণ্ঠে ভীলযুবকের হস্ত ধরিয়া বলিল, "কেন দেরী ক'চ্ছেস্ আয় নদীতে ঝাঁপ দি।"

বিদ্যুতালোকে দেখিল, ধারার বুকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তাণ্ডব-নর্ত্তনে ছুটিতেছে, আবার ভেরী বাজিল—এবার যেন অতি দীর্ঘ, অতি ব্যাকুলভাবে ভেরী বাজিয়া উঠিল। বিজলী ঝালুর গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—ভাব্‌ছিস্ কি ? আয় আমরা নদীতে ঝাঁপ দি, তুই আমাকে ধরে সাঁতার দে, বিজলী ঝালুকে টানিয়া নদীতীরে লইয়া গেল। আকাশে বজ্র ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ঠিক সেই মূহুর্ত্তেই "জয় কালি মায়ি" বলিয়া ভীলদম্পতি নদীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

(৬)

অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই উত্তাল-তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতি-ঘাত অতিক্রম করিয়া ভেলু-গ্রাম হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে ঝালুর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার—অল্প অল্প জোছনা ফুটিতেছে, বিজলী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ঝালু তাহাকে টানিয়া তীরে তুলিল। বিজলী তখন বড় বড় শ্বাস টানিতেছিল, কথা বলিবার শক্তি ছিল না—উৎফুল্ল ম্লান দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, সে দৃষ্টি বড় পবিত্র, কর্ত্তব্য-পালন-জনিত আনন্দ-মণ্ডিত ; দারুণ পরিশ্রমে সমস্ত

অঙ্গ শিথিল, সমস্ত শক্তি যেন মূহুর্ত্তের জন্য প্রবল হইয়া তাহার চাহনিতে ফুটিয়া উঠিল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ঝালু তাহা :স্পষ্ট দেখিতে পাইল—কাতরকণ্ঠে ঝালু ডাকিল—বিজলী? সৈকত-ভূমি ঘিরিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, "বিজলী"। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আবার ভেরী বাজিয়া উঠিল। কঠোর নির্ঘোষে ভেরীর আকুল আহ্বান—ঝালু আর স্থির থাকিতে পারিল না—কঠোর কর্ত্তব্য তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। একবার বিজলীর অধরে অধর সংলগ্ন করিয়া চক্ষের জল মুছিয়া দৃঢ়ভাবে বর্ষাটী ধরিয়া ঝালু উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার ভেরী বাজিয়া উঠিল। তাহার কিছু ভাবিবার অবসর নাই, দেখিবার অবসর নাই—কঠোর কর্ত্তব্য পরায়ণ ভীলযুবক উন্মত্তের মত তীর-বেগে ভেরীর শব্দের অনুসরণ করিয়া ছুটিল। সেই নির্জ্জন সৈকতে জ্যোৎস্নার আলোকে, মুমূর্ষ ভীলযুবতী স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তায় সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক করিয়া অতুল গৌরবে স্বর্গারোহণ করিল।



চুম্বক।

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন আমি হিলিতে পোষ্ট মাষ্টার ছিলাম। হিলি স্থানটী অতি মনোরম। প্রকৃতি সেখানে যেন শোভা ছড়াইয়া দিয়াছে। সেখানকার লোক-গুলি খুব সরল ছিল। আমি সেখানে সামান্য পোষ্টমাষ্টার হইয়া জমীদারের সমতুল্য মান্য পাইতাম। সেখানে একটী আশ্চর্য্য রহস্যপূর্ণ ঘটনা শুনিয়াছিলাম। আজ সেই ঘটনাটী বলিব।

আমাদের পাড়ায় জগদ্বন্ধু বাবু একজন ধনীব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার অতুল বৈভব; একমাত্র পুত্র বিনয়কুমার বড় আদরের ছেলে—ছেলে ভাল; গ্রাম্যস্কুলে এণ্ট্রান্স পড়িতেছে, এখনও বিবাহ হয় নাই। গৃহিণীর বড় ইচ্ছা

তাঁহার অষ্টাদশ বৎসরের বিনয়ের বিবাহ দিয়া একটী নববধূ গৃহে আনেন। কর্ত্তা জগদ্বন্ধু বাবু 'আজ নয়' 'কাল নয়' করিয়া পুত্রের এণ্ট্রান্স পাশের অপেক্ষায় আছেন। বিনয় যথার্থ বিনয়ে ভূষিত। হিলির ক্ষুদ্র গ্রামের সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। বিনয় প্রত্যহ ১০টার সময় হাঁটিয়াই স্কুলে যাইত; স্কুল নিকটবর্ত্তী—সঙ্গে কেহ যাইত না। তাহার যাইবার পথে, কবরখানা বলিয়া একটা স্থান ছিল, সেই স্থানটী প্রায় এক মাইল লইয়া বেষ্টিত; সমতল ভূমি হইতে কবরখানা অনেক উচ্চ এবং তাহা জঙ্গলে পূর্ণ ও ভীতিকর ছিল। জনশ্রুতি, বহুপূর্ব্বে কোন মুসলমান ধনীব্যক্তির আদরের কন্যার মৃত্যুতে ঐ কবরভূমি নির্ম্মিত হয়। ঐ খানেই সেই আদরিণী কন্যার সমাধি হইয়াছিল। লোকে বলিত কবরখানায় ভূত আছে।* কল্পনাদেবীর কোন কোন বরপুত্র জনসাধারণে গল্প করিত যে, ঐ উচ্চ ভূমিতে চন্দ্রিমার রাত্রে শুভ্রবস্ত্রে মণ্ডিত কোন স্ত্রীলোক দেখিয়াছে; কেহ কেহ বলিত, মুখে আগুন প্রকাণ্ড এক কঙ্কাল বিশিষ্ট মনুষ্যকে মুখ হইতে অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে, মড়ার মাথা লইয়া খেলা করিতে দেখিয়াছে—আবার কেহ বলিত, বিশাল ভীমাকৃতি শরীর, মস্তকহীন, বক্ষে দুই চক্ষু

সেই ময়দানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে; তাহার চক্ষু দুটী আগুনের মত জ্বলে,—ইত্যাদি নানাপ্রকার জনরবে দিনের বেলায়ও সেখানে গ্রামের কেহ যাইতে সাহস করিত না। শুনা যায়—আমার পূর্ব্বে, আমারই পদে এখানে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যা একদিন উল্লিখিত স্থানে বেড়াইতে যায়। বেড়াইয়া আসিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনার পর হইতেই উক্ত স্থানের প্রবাদ সম্বন্ধে লোকের মনের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়াছিল।

(২)

সোমবার বিনয়কুমার স্কুলে যাইতেছিল, তখনও ১০টা বাজে নাই, দিনটা একটু মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা, টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তায় কাদা, ছাতা মাথায় দিয়া বিনয় হাঁটুর কাপড় তুলিয়া স্কুলে যাইতেছিল। কবরখানার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার মনে পূর্ব্বের জনশ্রুতি সম্বন্ধে নানারূপ কথা উদয় হইয়া ভীতি সম্পাদন করিতেছিল। এমন সময় দেখিল কবরখানার মধ্যস্থলের একটী ঝোপের আড়াল হইতে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা হাত-খানি দিয়া বিনয়কুমারকে ডাকিল। বিনয় দেখিল, এমন

সুন্দর মুখ, এমন সুন্দর চক্ষু, এমন সুন্দর চুল ইতিপূর্ব্বে সে কখন দেখে নাই, সে বালিকাকে কোন দেবী বলিয়া মনে করিল। সে তাহার ইঙ্গিত প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না; বা সে সময় তাহার কোন ভাবের উদয় হইল না। সে যেন কিসের আকর্ষণে বালিকার নিকট গেল। বালিকা, বিনয়ের হাত ধরিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"এখানে একটু বসিয়া যাও না।" বিনয়ের কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল। সে কোন আপত্তি করিল না, বা তাহার আপত্তি করিবার কোন শক্তিই ছিল না। বালিকা বিনয়ের হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে ঝোঁপের ভিতর লইয়া গেল। ঝোঁপের ভিতরে একটী ছোট দরজা ছিল, সে তাহাতে আঘাত করিবামাত্র খুলিয়া গেল—তাহার সংলগ্ন সিঁড়ি, নীচে যাইবার পথ বলিয়া বোধ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার ভিতর সূর্য্য-কিরণে আলোকিত হইতেছিল। বিনয়কুমারকে সঙ্গে করিয়া বালিকা ভিতরে নামিয়া গেল। বালিকা বিনয়কে একখানি কোচের উপর বসাইল। গৃহটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, তাহার উপরে নানারূপ সুগন্ধবিশিষ্ট পুষ্প ছড়ান ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যের সুরভিতে গৃহ আমোদিত। এক পাশে একটী দেরাজের

উপর নানারূপ বাজাইবার যন্ত্র সজ্জিত। বিনয়ের তখন জ্ঞান নাই, তাহার মনে হইতেছে—আমি বাড়ীতেই আছি। সে যে কবরখানার মধ্যস্থিত গৃহে বসিয়া—তাহা তাহার একবারও মনে হইতেছিল না। বালিকা 'পান খাবে' বলিয়া একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত ডিবার মধ্য হইতে মৃগনাভি ইত্যাদির দ্বারা সুগন্ধসম্পন্ন তাম্বুল বিনয়কুমারকে খাইতে দিল। বিনয় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পান মুখে দিয়া বলিল,—ভাই, তোমার নাম কি? বালিকা একটু হাসিয়া বলিল, "সোফিয়া।" বিনয় হাত ধরিয়া চিবুক নাড়িয়া বলিল,—সোফিয়া তুমি বড় সুন্দর। লজ্জায় বালিকার গণ্ড রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। সুন্দরীর সকলই সুন্দর—লজ্জানতা সুন্দরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিনয় আত্মবিস্মৃত হইয়া দেখিতে লাগিল। আমোদ-আহ্লাদে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বালিকা বলিল,—ভাই বেলা গেল, বাড়ী যাও। বিনয়ের তখন বাড়ী যাইবার কথা মনে পড়িল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বালিকা বিনয়ের হাত দুটী ধরিয়া করুণ-দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিল,—কাল আসবে? "নিশ্চয়" এই বলিয়া বিনয় সোফিয়াকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া একটী চুম্বন করিয়া বলিল,—এমন সুন্দর মুখ কি ভোলা যায়? সোফিয়া ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া বলিল,—তবে নিশ্চয়

আস্‌বে? "হাঁ নিশ্চয় আস্‌বো"। সোফিয়া দুটী পান আনিয়া বিনয়ের মুখে গুঁজিয়া দিয়া চুম্বন প্রত্যর্পণ করিল। বিনয় ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কবরখানা দেখা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন সোফিয়ার মুখ তাহার গণ্ডে সংলগ্ন ছিল। কবরখানা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেই যেন কোন অভূতপূর্ব্ব শক্তিবলে সোফিয়ার স্মৃতি তাহার মন হইতে অপসৃত করিয়া লইল। সোফিয়া সম্বন্ধে তাহার আর কোন কথা মনে রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছে।

(৩)

বিনয় প্রত্যহই স্কুলে যায়, প্রত্যহই সোফিয়ার সহিত কবরখানাতে দেখাও হয়—সমস্ত দিন আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া ঠিক স্কুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে বাড়ীতে ফেরে। মধ্যাহ্নের কথা তাহার বৈকালে মনে থাকিত না—কোথায় ছিলাম, স্কুলে গিয়াছিলাম কিনা, ইত্যাদি কিছুই তাহার মনে পড়িত না। তাহার মনে হইত, স্কুলেই গিয়াছিলাম; ঠিক পরদিন স্কুলে যাইবার সময়েই আপনা আপনি সোফিয়ার কথা

মনে পড়িত, সে একমুহূর্ত্ত গৃহে থাকিতে পারিত না; কোন প্রকারে দুইটী অন্ন মুখে গুঁজিয়া কবরখানাভিমুখে গমন করিত, ভাবিত দু'একটা কথা বলিয়াই স্কুলে যাইবে কিন্তু তাহা ঘটিত না। কবরখানা হইতে প্রত্যহই সোফিয়া সেই ঝুপ্সির পার্শ্ব হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিত। বিনয় নিকটে গেলেই হাত ধরিয়া নিম্নসিঁড়িতে হাসিতে হাসিতে নামিয়া যাইত। বিনয়কুমার জগৎ সোফিয়াময় দেখিত, তাহার মনে হইত, সংসার পিতা মাতা আত্মীয়স্বজন, সব একদিকে, অন্য দিকে সোফিয়া—সোফিয়াই তাহার জীবন-সূর্য্যের কেন্দ্র। জগদ্বন্ধু বাবু দেখিলেন, পুত্রের শরীর ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিনয়ের সে কান্তি নাই, সে লাবণ্য নাই, সব যেন শুকাইয়া গিয়াছে। পিতা ভাবিলেন, অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনার জন্য বোধ হয় ঐরূপ হইবে। একদিন জগদ্বন্ধু বাবু বিনয়কুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা জীবনই মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু, স্বাস্থ্য তাহারই আনুসাঙ্গিক; দেখিতেছি তোমার স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইয়া যাইতেছে, পড়াশুনা কম করিও। স্বাস্থ্য থাকিলে জীবনে অনেক শিক্ষা করিতে পারিবে; নতুবা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া পড়িবার কোনই প্রয়োজন নাই।"

(৪)

ইহার পর মাসাবধি গেল। বিনয়ের কোন স্বাস্থ্যোন্নতি দেখা গেল না। সে যেন ক্রমেই আরো শুকাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। যে বিনয় ইতিপূর্ব্বে ১৫ সের ওজনের মুগুর এক্সারসাইজ করিত, আজ সে একটী মুগুর দুই হাতে তুলিতে কষ্ট বোধ করে। বিনয়ের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া পিতা বড়ই ভীত হইলেন। গ্রামের কবিরাজ রামশরণের মত লইয়া পুত্রকে স্কুলে যাইতে নিষেধ করিলেন—বিনয় শুনিল না। উত্তরে বলিল,—একজামিনটা না দিয়া পড়াশুনা ছাড়িতে পারিতেছি না—বলিয়া স্কুলে গমন করিল। কবরখানার নিকটবর্ত্তী হইলেই সোফিয়া আসিয়া বিনয়কুমারের দুই হাত ধরিয়া বলিল,—আজ এত দেরী কল্লে কেন? বিনয়কুমার উত্তর করিল,—বাবা ব'লেছেন আর স্কুলে যাবার প্রয়োজন নাই। সোফিয়া প্রেমপূর্ণ সজল-নয়নে বলিল,—তা'হলে আর তুমি আসিবে না? বিনয়কুমার উত্তর করিল,—কি ক'রে আর দেখা হবে, সোফিয়া? বালিকার আর সহ্য হইল না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। বিনয়ের বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রুজলে বিনয়ের বুক ভাসাইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল,—তবে কি তোমার

সঙ্গে এই শেষ দেখা? বিনয়েরও সে মর্ম্মস্পর্শীকথা সহ্য হইল না; বিনয় দৃঢ়ব্রত হইয়া বলিল,—প্রাণ যায় সেও ভাল, লজ্জা পাইতে হয়, সেও ভাল, তবু তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। বালিকা সোফিয়া সেদিনকার মত কতকটা আশ্বস্ত হইল। একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহ কাল কাটিল। বিনয় প্রত্যহই পিতার অসম্মতিতেও স্কুলে যায়—তিনি আর একদিন পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন,—তোমাকে রোজ বারণ করি তবু স্কুলে যাও, আজ আর স্কুলে যাইও না। বিনয় কোন উত্তর না করিয়া মাতার নিকট হইতে ভাত চাহিয়া লইয়া খাইতে বসিল। আহারান্তে পিতার বারণ সত্ত্বেও স্কুলে গেল। পিতা যে রাগ করিবেন, ইহা বিনয়ের মনে তখন স্থান পাইল না। চুম্বকে লৌহ আকর্ষণ করিলে, লৌহকে যেমন বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যাইতে বাধ্য করে বিনয়কেও সোফিয়া তেমনই রূপাকর্ষণে পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বে যাইতে বাধ্য করিল। জগবন্ধু বাবুর কেমন সন্দেহ হইল; তিনি স্কুলে যাইয়া বিনয়ের নাম কর্ত্তন করিয়া আনিতে মনস্থ করিলেন। স্কুলে গিয়া শুনিলেন, পুত্র প্রায় তিন মাস হইল স্কুলে যায় না—শুনিয়া জগবন্ধু বাবু চমকিত হইলেন। ভাবিলেন, বিনয় যদি স্কুলে না আসে, তবে যায় কোথায়?

বাড়ীতে ফিরিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না—এমন কি গৃহিণীকে এ সংবাদ জানিতে দিলেন না—পরদিন বিনয় যখন স্কুলে গেল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী ভৃত্যকে কোথায় যায় গোপনে অনুসন্ধান করিবার অনুমতি করিলেন। ভৃত্য বিনয়ের অজ্ঞাতে তাহার অনুসরণ করিল; সে দেখিল, বিনয়কুমার কবরখানার উপর উঠিল, তারপর আর বিনয়কুমারকে দেখা গেল না। ভৃত্য একে ছোট লোক—তাহাতে সম্মুখেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অন্তরে অন্তরে বড়ই ভীত হইল—সে আর সেখানে অপেক্ষা করিল না। বিনয়কুমার পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে কিনা দেখিবার সাহস করিল না। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্য বলিল,—বাবু, দাদাবাবু কবরখানায় গেল—আর ফিরিল না। জগদ্বন্ধু বাবু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ঠিক চারিটার সময় বিনয় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরদিন বিনয় যখন স্কুলে গেল, জগদ্বন্ধু বাবু পুত্রের অলক্ষ্যে অনুসরণ করিলেন—দেখিলেন বিনয় কবরখানার উপরে উঠিল, আড়াল ঝোপের হইতে অপ্সরাবৎ একটী সুন্দরী বালিকা আলুলায়িত কেশে বন-বালিকার মত ছুটিয়া আসিয়া বিনয়ের হাত ধরিল। বিনয় যেন কি বলিল, পরে উভয়ে নিকটস্থ ঝোপের ভিতর

গেল, পরে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। জগদ্বন্ধু বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঝোঁপের নিকটে গেলেন, দেখিলেন তাহার ভিতরে একটী ক্ষুদ্র দ্বার। দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ, স্থানটী মনুষ্য-পদবিক্ষেপে অপেক্ষাকৃত অন্য স্থান অপেক্ষা পরিষ্কৃত ছিল। জগদ্বন্ধু সেইখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা করিয়া ক্রমে চারিটা বাজিল, সেই সময়ে সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া সোফিয়া ও বিনয়কুমার বাহির হইল। সোফিয়া হাসিয়া হাসিয়া কত বলিল, জগদ্বন্ধু বাবু শুনিতে পাইলেন না কেবল এইমাত্র শুনিতে পাইলেন, "কাল আসিবে তো?" বিনয় উত্তর করিল "আসিব।" এই বলিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল। সোফিয়াও সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া নীচে নামিয়া গেল। জগদ্বন্ধু বাবু পুত্রের ভবিষ্যত ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাক্লিষ্ট-বদনে ধীরে ধীরে গৃহে আসিলেন। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি আজ বিষণ্ণ কেন? জগদ্বন্ধু বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আর বিনয়কে বাঁচাইতে পারিলাম না—বুঝি তাহাকে পরীতে পাইয়াছে।"

পরদিন ঠিক দশটার সময় বিনয় স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল—পিতা বারণ করিল, পুত্র শুনিল না—

জগদ্বন্ধু বাবু বিনয়কে রাস্তা হইতে ধরিয়া আনিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। বিনয় আবার যাইবার জন্য ঘর হইতে জোর করিয়া বাহির হইল ; পিতা বাধা দিতে পারিলেন না। এই অষ্টাদশবর্ষীয় রুগ্ন যুবকের বল দেখিয়া জগদ্বন্ধু বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভৃত্যের সাহায্যে আবার বহুকষ্টে বিনয়কে ধরিয়া আনিয়া বৈঠকখানা ঘরে বন্ধ করিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গৃহ ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার জন্য বিনয়কুমার যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন তাহার জ্ঞান ছিল না, চক্ষু দুটী রক্তজবাবৎ হইয়াছিল, কোন অনৈসর্গিক বস্তু যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। বিনয়কুমার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাগলের মত বলিতে লাগিল, সোফিয়া দাঁড়াও, আমি যাইতেছি—পরমুহূর্ত্তেই সে দরজা ভাঙ্গিবার জন্য ভিতর হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আবার হতাশ্বাসে আগ্রহপূর্ণ ভাবে বলিতে লাগিল,—ওগো আমায় একবার ছেড়ে দাও, একবার আমার সোফিয়াকে দেখে আসি—সোফিয়া ! সোফিয়া ! তোমায় দেখ্‌তে পেলুম না—ইত্যাদি বলিয়া আপনা আপনি শিরে করাঘাত করিয়া চুল ছিঁড়িতে লাগিল—এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া চারিটা বাজিল—তখন তাহার পূর্ব্ববৎ জ্ঞান হইল। কেন যে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে ভাবিয়া পাইল না—

তাই স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা আমায় বন্ধ ক'রে রাখা হ'য়েছে কেন? জগদ্বন্ধু বাবু কোন উত্তর না দিয়া বিনয়কুমারকে ছাড়িয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি বিনয়ের কোন উপসর্গ দেখা গেল না, আবার পরদিন পূর্ব্ববৎ বেলা ১০টার পর হইতেই বিনয়ের বিকৃতভাব দেখা দিল। সেদিনও সেই ভাবে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। পুনরায় বৈকালে পূর্ব্ব জ্ঞান ফিরাইয়া পাইল; মধ্যাহ্নের কথা কিছুই মনে পড়িল না। দিনের পর দিন গেল, এইরূপে সপ্তাহ কাটিয়া গেল—জগদ্বন্ধু বাবু বড়ই ভীত হইলেন, পুত্রের অবস্থা দিন দিন বড়ই শোচনীয় হইতে লাগিল। হিলির সমস্ত ডাক্তার কবিরাজকে দেখান হইল, কেহই কোন রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া পুত্রের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। অনেক বিজ্ঞ ডাক্তার দেখান হইল, কোনরূপ ফল দর্শিল না। শেষে একজন ডাক্তার বলিলেন, অতিরিক্ত অন্যায় অত্যাচারের জন্য ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, একটী সুন্দরী বয়স্থা কন্যার সহিত যত শীঘ্র পারেন বিবাহ দিন, তাহা হইলে সমস্ত উপসর্গ সারিয়া যাইবে। ডাক্তারের মতের সহিত জগদ্বন্ধু বাবুরও মত মিলিল। তিনি শীঘ্রই বিনয়ের বিবাহ দিয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া কিছুদিনের জন্য

থাকিবেন এইরূপ মনস্থ করিলেন, কার্য্যেও তাহাই হইল। ঈশ্বরানুগ্রহে ক্রমে ক্রমে বিনয়কুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। জগদ্বন্ধু বাবু কালিঘাটে জোড়া মহিষ পূজা দিয়া আট মাস পরে পুত্র, পুত্রবধু লইয়া স্বদেশ গমন করিলেন। আসিয়াই কবরখানার সেই ক্ষুদ্র দ্বারটী দৃঢ়রূপে গাঁথাইয়া দিলেন।

(৫)

চন্দ্রকিরণ বিধৌত সমীরণ হিল্লোলে বাড়ীর পার্শ্বের খিড়কীর মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপানে বসিয়া বিনয়কুমার স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল। চন্দ্রকিরণ অসীমা সুন্দরীর সুন্দর বদনে প্রতিফলিত হওয়াতে সুন্দরবদন আরও সুন্দর দেখাতেইছিল। ভ্রমর বিনিন্দিত কৃষ্ণ অলকাগুচ্ছ সমীরণ হিল্লোলে অসীমার বদনমণ্ডলে পতিত হইয়া ভাসমান মেঘযুক্ত চন্দ্রের মত দেখাইতেছিল। বিনয় সেই রূপে তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল—এমনসুন্দর বোধ হয় পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। অসীমাসুন্দরীর গলায় একছড়া বেলফুলের মালা ছিল, সেও চন্দ্রকিরণে চন্দ্রিমার মত স্নিগ্ধরূপে বিনয়ের চক্ষু জুড়াইতেছিল। বিনয় ভাবিতে-ছিল, ফুলের গায়ে ফুল কেমন সুন্দর দেখায়—তাই বুঝি

কবিরা ফুলের এত আদর করেন—তাই বুঝি প্রেমিকেরা ফুলের মালা গাঁথিয়া আদরের আদরিণীকে কত আদরে আবেগভরে গলায় পরাইয়া দেন—তাই বুঝি হিন্দুরা মাল্যবদল করিয়া ফুলের বিনিময়ে ফুল কিনিয়া থাকে। বিনয় অসীমাসুন্দরীর হাত ধরিয়া প্রাণের আবেগে বলিল, অসীমা, তুমি বড় সুন্দর। অসীমা ও প্রাণের আবেগে নিজ ভুজপাশে স্বামীর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া তাহার গণ্ডস্থলে একটী চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আর সোফিয়া?

বিনয় একটু বিষণ্ণতার হাসি হাসিয়া বলিল,—আমি কি এক অদ্ভুত শক্তিবলে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না—অসীমা! তুমি দেবীপ্রতিমা—সে আকর্ষণী শক্তি-ধারিণী চুম্বক।



(হীরক খণ্ড)

(১)

"তুমি এত বিমর্ষ কেন রোস্তমজী ?"

এই বলিয়া একটী যুবতী একটী যুবকের হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। যুবতী সুন্দরী,—চক্ষু দুটী বড় সুন্দর ; তাহার চাহনিটী আরও সুন্দর। তখন অনন্ত নীল সমুদ্রে অস্তাচলগামী সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়া ছিল। ঝাঁক বাঁধিয়া সামুদ্রিক পক্ষী শ্বেত মেঘ খণ্ডের মত আকাশের গায়ে ভাসিয়া যাইতেছিল। বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ রাশি বন্দরের তলদেশে লাগিয়া, বিক্ষিপ্ত মুক্তারাশির

ন্ধায় উছলিয়া পড়িতেছিল। যুবক বোম্বের কোন বন্দরে দাঁড়াইয়া উদাস ভাবে সমুদ্রের দিকে চাহিয়াছিলেন। যুবতীর কথা যুবক শুনিতে পাইলেন না। যুবক বড় চিন্তিত; তাঁহার চিন্তার কারণ অর্থ; সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, পিতার অতুল ধনসম্পত্তি, তিনি বোম্বের ধনকুবের বিশেষ। যুবক তাঁহার পিতার এক মাত্র পুত্র, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি এমেলিকে বিবাহ করিতে চান, তাহাতেই তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাহার নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ পত্র পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ঋণ করিয়া তিনি একটা হোটেলে আছেন, ক্রমশঃই ঋণ বাড়িতেছে, পরিশোধের উপায় নাই, এরূপ ভাবে কয়দিন চলিবে? তাই যুবক আজ বড় চিন্তিত, সুন্দরী এমেলি তাহার এরূপ ভাব কখন দেখে নাই। সদানন্দ পুরুষ,—চিন্তা কাহাকে বলে জানেন না; তাঁহার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে এমেলি বড়ই আশ্চর্যান্বিতা হইয়াছেন। রোস্তম ভিতরের কথা এমেলিকে কিছুই বলেন নাই। এই সমুদ্র তীরে একদিন দুইজনে কথা বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, আজ সেই রোস্তম নীরব। এমেলি আবার ডাকিল "রোস্তম"! এইবার রোস্তমের চমক ভাঙ্গিল সে ধীরে ধীরে এমেলির মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি শান্ত, শীতল, মধুর প্রেমপূর্ণ

—কিন্তু দীপ্তিহীন ও উদ্‌ভ্রান্ত। যুবতী বলিল—রোস্তম! তুমি অমন কোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলে যে? রোস্তম অতি যত্নে কোমল হস্তে সন্তর্পণে সাগ্রহে যুবতীর হাত দুটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমি আর একবার পিতাকে বলিব, পায়ে ধরিয়া তাঁহার নিকট তোমার সহিত বিবাহের সম্মতি প্রার্থনা করিব, দেখি কি হয়? এমেলির চক্ষু দুটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—রুস্তম! আমার জন্য আর কত কঠোরতা সহ্য করিবে? রুস্তম একটু মৃদু হাসিল, সেই একটু হাসির ভিতর এমেলির প্রতি তাহার উদ্বেলিত প্রেমরাশি উছলিয়া পড়িল; সে হাসিতে কত দৃঢ়তা, ভাষায় তাহা প্রকাশ হয় না। ঐ ম্লান হাসিটুকুই বুঝি রুস্তমের হৃদয় ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। রুস্তম এমেলির হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

(২)

প্রাসাদ তুল্য হর্ম্মের সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া বোম্বের ধনকুবের পান্থজী নিবিষ্ট মনে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে হিসাবের খাতা পত্র দেখিতে ছিলেন। পান্থজী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও কৃশ, সমস্ত চুলদাড়ি শুভ্র। চক্ষু উজ্জ্বল ও সতেজ, ললাট কিঞ্চিৎ

কুঞ্চিত দেখিলেই দৃঢ় চেতা বলিয়া মনে হয়। ধীরে ধীরে রুস্তমজী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। পদশব্দে একবার বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া দেখিলেন, চসমার ভিতর হইতে তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; ইঙ্গিত করিয়া পুত্রকে সম্মুখস্থ আসনে বসিতে বলিলেন, আবার তেমনি নিবিষ্ট মনে হিসাবের খাতা পত্র দেখিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল পিতা পুত্র নীরব! তাহার পর কাগজ পত্র গুছাইয়া রাখিয়া চেয়ারখানি একটু পুত্রের নিকট টানিয়া লইয়া পুত্রের মুখেরদিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন রুস্তম! বোধ হয় তুমি তোমার ভুল বুঝিতে পারিয়া থাকিবে। রুস্তম বলিলেন, আমি কিছুই করি নাই, কিন্তু আপনি আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন কেন?

কেন? তুমি এমেলিকে পরিত্যাগ কর।

আমি তাহা পারিব না, আপনার পুত্র হইয়া আমি প্রবঞ্চক হইব কিরূপে? এমেলি আমাকে বিশ্বাস করে, আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারিব না। পিতা মার্জ্জনা করুন, এমেলিকে বিবাহের অনুমতি দিন। দৃঢ়স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—তাহা কথনই হইবে না। তুমি এমেলিকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ছুঁড়িটা, দেখিতেছি,

তোমাকে একেবারে যাদু করিয়াছে। "না বাবা আমিই অপরাধী, আমিই তাহাকে দেখিয়া প্রথম মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সরল বিশ্বাসে সে আমায় ভাল বাসিয়াছে, তাহার কোন অপরাধ নাই" তুমি কি বলিতে চাও, তুমি আমার বিরুদ্ধে এমেলিকে বিবাহ করিবে? না তাইতো আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি; এমেলির উচ্চবংশে জন্ম। তাহা আমি জানি কিন্তু দরিদ্র,—জানি সে সুন্দরী, কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সন্তাবজীর কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে চাই, তাহার কন্যাটীও মন্দ নয়, ভবিষ্যতে তুমিই তাঁহার অতুল বিভবের অধিকারী হইবে।

পিতা আমি আপনার এক মাত্র পুত্র। আপনার কোন বিষয়েরই অভাব নাই—এই বোম্বাই নগরে আপনি প্রধান ধনী।

তাহা জানি; কিন্তু আরও বড় হইতে দোষ কি? উপস্থিত সময়ে অর্থোন্নতি সমাজ উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়, এরূপ অবস্থায় বুদ্ধির দোষে তাহা নষ্ট করা উচিত নয়; অতএব তুমি এমেলিকে বিবাহের আশা পরিত্যাগ কর।

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রুস্তমজী কহিল—অর্থ অপেক্ষা কি এসংসারে আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই?

থাকিতে পারে কিন্তু বড় একটা কিছু দেখিনা অর্থই সম্মান, অর্থ ভিন্ন এসংসারে কোন সুখই হয় না।

না বাবা! আরো কিছু আছে—সে শান্তি, সরল নিঃস্বার্থ প্রণয়; আপনি অনুমতি করুন আমি সেই পরম শান্তি লাভ করি।

কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধস্বরে পান্থজী কহিলেন—আমাকে অধিক বকাইও না, শান্তি কি তাহা বুঝিবার এখনও তোমার বয়স হয় নাই, আমি তোমার শুভই করিব, পরে বুঝিবে সন্তাবজীর কন্যাকে বিবাহ করায় তোমার কি লাভ হইয়াছে ?

কাতরকণ্ঠে রুস্তম কহিল, আপনার চরণে নিয়তই অপরাধ করিতেছি, আপনি চির স্নেহময় আমার প্রতি কঠোর হইবেন না। এমেলিকে বিবাহ করিবার অনুমতি দিন, বলিয়া রুস্তমজী পিতার চরণ স্পর্শ করিল, পান্থজী উঠিয়া দাঁড়ালেন, দৃঢ়স্বরে পুত্রকে বলিলেন—তাহা কখনই হইবে না, আমার মতের বিরুদ্ধে চলিলে, তোমার পক্ষে অশুভ হইবে। দ্রুতপদে বৃদ্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেই হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া যুবক একবার জানালার দিকে চাহিল, নীল আকাশ সহস্র চক্ষু প্রসারিত করিয়া প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে ধরণীর প্রতি সাগ্রহে চাহিয়া

আছে। স্থির, ধীর, অচঞ্চল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে রুস্তম কক্ষ ত্যাগ করিল।

(৩)

"ঋণদায় বড়দায়"। ক্রমশঃই রুস্তম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ধনী সন্তান, সংযত হইয়া চলিতে শিক্ষা করে নাই, এ অবস্থাতেও সে পূর্ব্বের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ঋণ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। এ অর্থ কষ্টে অপমানের হাত হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাওয়া যায়, রুস্তম কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এক দিন রুস্তম বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত রত্নবণিকের দোকানে গেল; রত্নবণিক তাহাকে চিনিত, পূর্ব্বে বহু লক্ষ টাকার জহরত তাঁহার নিকট বিক্রয় করিয়াছে। খুব সম্মানের সহিত রত্নবণিক স্বয়ং রুস্তমের অভ্যর্থনা করিল। রুস্তম রত্নবণিককে বলিল—আমাকে এমন এক খণ্ড হীরক দিতে পারেন, যাহার আর একখানি পাওয়া দুষ্কর। রত্নবণিক একখানি হীরক দেখাইলেন—সচরাচর সেরূপ হীরক দেখা যায় না। রুস্তমজীও হীরক চিনিতেন—দুষ্প্রাপ্য বুঝিতে পারিয়া সেইখানিই লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পাঁচলক্ষ টাকা মূল্য স্থির হইল। রুস্তমজী

কিছুদিন পর মূল্য পরিশোধ করিবেন, বলিয়া হীরক খণ্ড গ্রহণ করিলেন। রত্নবণিক বিশেষ কোন আপত্তি করিল না। কারণ সে রুস্তমজীকে চিনিত, বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ধনকুবেরের পুত্রের নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করা বিশেষ কষ্টকর নয়, তাঁহা তাহার ধারণা ছিল। রুস্তম হীরক খণ্ড আনিয়া আর একটী জহরতের দোকানে আড়াই লক্ষ টাকায় বাঁধা রাখিল। বাজারের ঋণ সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা নিজেদের বাসস্থান ও আহারাদির বন্দোবস্ত অপেক্ষাকৃত ভাল করিল। এমেলি এসমস্ত লক্ষ্য করিল; কিন্তু ভিতরের কথা কিছুই জানিতে পারিল না।

(৪)

কলসীর জল গড়াইয়া খাইলে কয়দিন থাকে? বিশেষ রুস্তমের পক্ষে এ অর্থ অতি সামান্য। আবার ক্রমশঃ ঋণ দায়ে জড়িত হইয়া পড়িতে লাগিল, রুস্তম আবার বিষণ্ণ হইল, আর তেমন ভাবে এমেলির সহিত ভাল করিয়া কথা বলে না, সর্ব্বদাই কি চিন্তা করে। এমেলি তাহা লক্ষ্য করিল। সরলা বালিকা রুস্তম ভিন্ন এসংসারে কিছুই জানে না। রুস্তমের সুখেই তাহার সুখ—রুস্তমের দুঃখেই তাহার দুঃখ—রুস্তমের সঙ্গে সঙ্গে এমিলিও

দিন দিন মলিন হইয়া পড়িল—রুস্তম তাহা লক্ষ্য করিল; রুস্তমের বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। আবার কি উপায়ে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে রুস্তম কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। একদিন রুস্তম আবার সেই রত্ন-বণিকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। রত্নবণিক টাকার কথা কিছু ভুলিলেন না; তিনি জানিতেন, সুযোগ হইলেই রুস্তম তাঁহার টাকা পরিশোধ করিবে। রুস্তম রত্ন-বণিককে বলিল, শীঘ্রই আমি আপনার টাকা পরিশোধ করিব, কিন্তু উপস্থিত আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, আপনার সেই হীরক খণ্ড আমার প্রিয়তমার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে, তিনি ঠিক এইরূপ আর একখানি হীরক চান, আপনাকে সংগ্রহ করিয়া দিতেই হইবে; মূল্য আপনি যাহা চান আমি তাহাই দিব। রত্নবণিকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, একটা মস্ত সুযোগ, প্রেমের দায়ে আমি যাহা চাই, রুস্তমজীকে সেই মূল্যেই হীরক খণ্ড ক্রয় করিতে হইবে। রত্নবণিক মাথা চুলকাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—তাইতো বড় মুস্কিলে ফেলিলেন। ঠিক ঐরূপ আর একখানি হীরক খণ্ড কোথায় পাইব? বিশেষ তাহা দুষ্প্রাপ্য জিনিষ—যাহোক আপনাকে পনের দিন পর আমি দিতে পারিব কি না

তাহার উত্তর দিব। রুস্তমজী বলিলেন,—তাহা হইলে আপনি কিছু বায়না গ্রহণ করুন। রত্নবণিক ভাবিল উপস্থিত একটা দর স্থির করিয়া বায়না লইলে ভবিষ্যতে অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। তাই সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—দেখুন জিনিষ আমার দোকানে নাই, কত মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারিব তাহাও স্থির নাই এরূপ অবস্থায় কিরূপে আপনার নিকট বায়না গ্রহণ করি?—জিনিষ সংগ্রহ হইলে যাহা হয় একটা মূল্য স্থির করিয়া লইবেন। রুস্তমজী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যাহোক্ আপনি চেষ্টায় থাকিবেন। নতুবা আমার মান থাকে না। রুস্তমজী চলিয়া গেল। রত্নবণিক একটা মস্ত দাঁও হাতে আসিয়াছে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

(৫)

পরদিন রুস্তমজী সংবাদ পত্রে তাহার হীরক খণ্ডের মত আর একখানি হীরক খণ্ডের জন্য পূর্ব্ব পরিচিত রত্নবণিকের বিজ্ঞাপন দেখিলেন; মূল্য চারিলক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল—সংবাদ পত্রে দেখিলেন, রত্নবণিক হীরকখণ্ডের

জন্য দশলক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত। তিনি তাহার এক ধনী বন্ধুর সহিত সাক্ষৎ করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে আড়াই লক্ষ টাকা লইয়া হীরকখণ্ডটী মহাজনের নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া বন্ধুর হস্তে দিয়া বলিলেন—এইরূপ এক খানি হীরক খণ্ডের জন্য বোম্বের বিখ্যাত রত্নবণিক দশলক্ষ টাকা মূল্য দিবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে। তুমি এই হীরকখণ্ড খানি তাঁহার নিকট লইয়া গিয়া বিক্রয় কর, তোমার টাকা বাদে আমার টাকা আমায় ফিরাইয়া দিও। হীরকখণ্ড কাহার প্রকাশ করিও না। তাহাতে আমার সম্মানের লাঘব হইবে। বন্ধু স্বীকৃত হইলে—লুব্ধ বণিক অধিক লাভের আশায় হীরকখণ্ড দশলক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করিলেন। হীরকখণ্ড বিক্রয়ের দুই চারিদিন পর পূর্ব্বক্রুত হীরকের সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়া রত্নবণিককে একখানা পত্র দিলেন "মহাশয় আপনার হীরকের মূল্যের টাকা পাঠাইলাম, পূর্ব্বে আপনাকে যে হীরকের কথা বলিয়া ছিলাম উপস্থিত তাহা আমার প্রয়োজন নাই।" দুরাকাঙ্ক্ষ বণিক কেন অধিক লাভের আশায় পূর্ব্বে বায়না লয় নাই, ভাবিয়া আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

(৬)

যখন সময় ভাল আসে তখন ধূলা ধরিলে সোণা হয়। রুস্তমজীরও তাহাই ঘটিল। রুস্তমজী হীরক বিক্রয়ের টাকায় আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা খুলিল। দুই বৎসরের ভিতর রুস্তমজী বোম্বাই নগরের একজন, বিখ্যাত বণিক হইয়া উঠিল। তাঁহার আর অর্থের কষ্ট নাই। আর দুশ্চিন্তায় তাহাকে অনিদ্রায় নিশাযাপন করিতে হয় না। এমেলিও রুস্তমেরসুখে সুখী। প্রফুল্ল কমল তখন আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ পান্থজী দেখিলেন, পুত্র উপার্জ্জনক্ষম, তাঁহার আনন্দ হইল আর পুত্রের উপর রাগ রহিল না। তিনি সাদরে এমেলির সহিত রুস্তমের বিবাহ দিয়া তাহাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিলেন। একদিন সন্ধ্যায় উদ্যানস্থিত হর্ম্ম্য—প্রাসাদ কক্ষে বসিয়া সাদরে রুস্তম এমেলির হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন—আমার সৌভাগ্যের কারণ কি জান ? এমেলি আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে রুস্তমের মুখের দিকে চাহিল—তখন পুষ্পগন্ধপূর্ণ মন্দ মলয় ধীরে ধীরে এমেলির কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশরাশি আন্দোলিত করিতেছিল। রুস্তমজী বলিলেন—“এই হীরক খণ্ড”। একখানি অত্যুজ্জ্বল বৃহৎ হীরক খণ্ড এমেলির হস্তে

দিলেন। গৃহের আলোক-জ্যোতিতে তাহা আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তিনি হীরক সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা এমিলিকে বিবৃত করিয়া বলিলেন,—এই হীরক খণ্ড পুনরায় দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। ইহা তুমি যত্ন করিয়া রাখিও। স্মরণ রাখিও আমাদের সৌভাগ্যের মূল এই "হীরক খণ্ড"।



ইন্দ্রাণী



"ইন্দ্রা—ইন্দ্রাণী" ওকি ?—বলিয়া ভয়বিহ্বলা বিমলচন্দ্রের নবপরিণীতা পত্নী সুলোচনা বিমলচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল। তখন রাত্রি গভীর—নৈশবায়ু জানালার পার্শ্ব হইতে হুহুঙ্কার শব্দে গর্জ্জন করিতেছিল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছিল। বিমলচন্দ্র চমকিত হইয়া বলিলেন—তুমি এত ভয় করিতেছ কেন ? সুলোচনা আরও ভীত হইয়া বলিল—ঐ শোন। বিমলচন্দ্র স্থিরকর্ণে শুনিলেন, কে যেন সেই দুর্য্যোগের মধ্যে নৈশবায়ু শব্দ ভেদ করিয়া গম্ভীরস্বরে ডাকিতেছে—ইন্দ্রা—ইন্দ্রাণী ; বিমলচন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—আহা ! ও বড় দুর্ভাগা ! সুলোচনা বলিলেন—কে দুর্ভাগা ? বিমল-

চন্দ্র বলিলেন,—যাহার স্বরে তুমি ভয় পাইতেছিলে। বল কি? ও কি মানুষের স্বর? বিমলচন্দ্র বলিলেন—হাঁ। সুলোচনা বলিল—এই দুর্য্যোগে পশুপক্ষীও যে এ সময় আশ্রয় ত্যাগ করে না, এমন সময় কি মানুষে বাড়ীর বাহির হয়? বিমলচন্দ্র দুঃখ-বিজড়িত স্বরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—আমি ঐ দুর্ভাগ্যের জীবনী বলিতেছি, তুমি শোন—

"এই গ্রামের নিকটেই শ্যামপুকুর বলিয়া একটী গ্রাম আছে, সেই গ্রামে শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিয়া একটী ভদ্রলোক বাস করিতেন, তিনি এ গ্রামের নূতন বাসিন্দা, কোথা হইতে আসিয়াছিলেন কেহ জানিত না, কেবল তাঁহার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই সঙ্গে ছিল না। শ্রীশচন্দ্রের ব্যবহারে গ্রামের সকলে তাঁহার একরূপ অনুগত হইয়া পড়িল। শ্রীশচন্দ্রের সুকণ্ঠ ছিল, আমিও তাহার গান শুনিয়াছি—সেই তাঁহার ইঁমন্ রাগিণীর—

"নাথ! আমি এসেছি তোমার চরণতলে
ঐ শান্তি-স্নিগ্ধ করুণা-নীরে ডুব্‌বো ব'লে।"

আজিও আমার অন্তরের স্তরে স্তরে গাঁথা আছে।

"এক বৎসর দুই বৎসর ক্রমে তিন বৎসর কাটিয়া গেল; সুখবসন্ত পবনহিল্লোলিত নবপুষ্পটীর মত, শ্রীশ-

চন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী সুখবায়ু-হিল্লোলে, হিল্লোলিত হইতে-ছিল, তখন কেহই জানিতে পারে নাই, কেহই বুঝিতে পারে নাই, কোন মুহূর্ত্তে এই সুখ-পবন ও সুখশান্তির কাল হইবে। একদিন সন্ধ্যাকালে যখন চন্দ্র কিরণ শ্রীশচন্দ্রের কুটীর-সম্মুখস্থ উদ্যান-বাটীকা উদ্ভাসিত করিয়া, নীলবসনাবৃত লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় ধীর-পদবিক্ষেপে সৌন্দর্য্যগরিমা ছড়াইয়া কৃষ্ণ-মেঘান্তরাল হইতে উঁকি দিতেছিল, দু একটা পাপিয়া নিস্তব্ধ-রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অন্তর কাঁপাইয়া গগনপ্রান্তে মিশাইয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একটী যুবক তাড়াতাড়ি শ্রীশচন্দ্রের লতাকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই যেন সৌন্দর্য্যের কোন জীবন্ত-মূর্ত্তি চারিদিক চাহিয়া চকিতহারিণীর ন্যায় চঞ্চলচরণে শ্রীশচন্দ্রের বাটীর খিড়কী দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশচন্দ্র সেই গৃহে আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র ডাকিলেন—ইন্দ্রাণি! ইন্দ্রাণী শুনিতে পাইল না। চঞ্চল বায়ু ইন্দ্রাণীর অঞ্চল লইয়া তখন নব-কৌতুকে মত্ত ছিল। আবার শ্রীশচন্দ্র ডাকিলেন—ইন্দ্রাণি! এইবার ইন্দ্রাণীর চমক ভাঙ্গিল; চাহিয়া দেখিল সম্মুখে শ্রীশচন্দ্র। শ্রীশচন্দ্র বলিলেন—ইন্দ্রাণী তোমার চোখে জল কেন? ইন্দ্রাণী

বলিল—কই না? স্বর কিন্তু তখনও অশ্রু-বিজড়িত ছিল। তারপর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কিন্তু হিমানি আবৃত চন্দ্রের ন্যায় স্বচ্ছমূর্ত্তি হইলেও কেমন একটু বিষণ্ণতার ভাব ইন্দ্রাণীতে রহিয়াই গেল। শ্রীশচন্দ্র দুই হাজার টাকা স্ত্রীর নিকট রাখিয়া বলিলেন—সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দাও। ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে নোটগুলি প্রাচীরে গ্রথিত সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দিলেন।

"ইহার দুই চারিদিন পরেই সেই লতামণ্ডপে একটী যুবক ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রাণীও চারিদিকে চাহিয়া আপনাকে যেন লুক্কাইত করিয়া চঞ্চল-চরণে সেই লতামণ্ডপে প্রবেশ করিল। লতামণ্ডপে যে যুবক ইন্দ্রাণীর জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিল, সে ইন্দ্রাণীকে দেখিয়াই বলিল—তুমি তো সবই জান, তোমার স্বামীর নিকট আমার আর মুখ দেখাইবার পথ নাই, তাঁহার নিকট হইতে দুই হাজার টাকা লইয়া ব্যবসায় প্রবৃত্ত হই, অর্ব্বাচীন মূর্খ আমি, পরের কথায় ইহাতে নাবিয়াছিলাম; ব্যবসা না শিখিয়া অব্যবসায়ীর মত ব্যবসা করিতে গেলে, লোকসান হওয়া যে স্বতঃসিদ্ধ তাহা আমি তখন বুঝি নাই; দৃষ্টিহীন মূর্খের ভবিষ্যৎ যাহা হওয়া উচিত, আমারও তাহাই হইয়াছে। যাহারা

দোকান হইতে ধারে জিনিষ লইয়াছেন—"আজ দিব, কাল দিব" করিয়া এক পয়সাও দিতেছেন না; অথচ আমার মহাজনের টাকাও যথেষ্ট বাকী—সমস্ত দোকানের জিনিষ বিক্রয় করিয়া প্রায় এক হাজার টাকা হইবে; কিন্তু আমার বাজারে দেনা তিন হাজার টাকা, এই টাকা না দিতে পারিলে, আমার ব্যবসা মাটী হইবে। পরিশেষে আমাকে টাকার জন্য জেলে যাইতে হইবে। তাই আমি বড় বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি আমাকে কোনরূপে দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দাও। ইন্দ্রাণী শুষ্কমুখে যুবককে বলিল,—টাকাটা তাঁর কাছে চাও না কেন? তিনি অবশ্যই দিবেন। যুবক বলিল—জানি তিনি দিবেন, কিন্তু তাঁহার নিকট চাহিবার আর যে মুখ নাই। তাঁহার নিকট যাওয়া অপেক্ষা জেলে যাওয়া আমার সহস্রগুণে ভাল। ইন্দ্রাণী নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় ধীরভাবে যুবকের সমস্ত কথাগুলি শুনিল। কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা করিয়া ইন্দ্রাণী বলিল—আচ্ছা দিব, কল্য সন্ধ্যার সময় তুমি আসিও। যুবক আহ্লাদে অব্যক্ত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিল, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল ঝরিতেছিল,—কিছুক্ষণ যুবকের মুখে কথা সরিল না। পরে ধীরে ধীরে বাষ্পরুদ্ধ

কণ্ঠে বলিল, ইন্দ্রাণী ! আজ তুমি আমার প্রাণদান করিলে, এ ঋণ পরিশোধের শক্তি আমার নাই—বলিয়া যুবক বিদায় লইল। ইন্দ্রাণীও চক্ষু মুছিয়া বাড়ীর ভিতর গেল।

• "সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না ; কিন্তু কেহ এই সময় স্থায়ী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে ; কেহ শীঘ্র কাটাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। দারুণ দুশ্চিন্তায় ইন্দ্রাণীর নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকাল হইল, ফল-ফুল-শোভাময়ী পৃথিবী অনন্ত শোভাবিস্তার করিয়া হাসিতে লাগিলেন। দিন কাটিল, সন্ধ্যা হইল এক একটী করিয়া তারা উঠিয়া সমস্ত নীল গগন ভরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদও উঠিল। মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে কুঞ্জবনস্থ সমস্ত পুষ্পরাশি হাসিল। এমন সময় শ্রীশচন্দ্র ইন্দ্রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেদিনও ইন্দ্রাণী জানালার দিকে চাহিয়া যেন কি দেখিতেছিল, কি যেন ভাবিতেছিল—শ্রীশচন্দ্র ইন্দ্রাণীকে ডাকিলেন—আদর করিয়া এ বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রাণী একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল—কই কিছু না। শ্রীশচন্দ্র বলিলেন—ইন্দ্রাণী শুধু আজ নয় আজ কয়দিন হইতে তুমি কি এক রকম হইয়া গিয়াছ কেন ? আমাকে খুলিয়া বল। ইন্দ্রাণী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল—কই কিছু না এমন সময় শ্রীশচন্দ্র হঠাৎ একবার জানালার দিকে

চাহিলেন। দেখিলেন, একটী লোক (অবশ্য ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হইল) বাহির হইতে জানালা দিয়া ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গেল। শ্রীশচন্দ্র চমকিত হইয়া বলিলেন—ও কে ইন্দ্রাণী? ইন্দ্রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। বাতাহত-কদলীপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল—কই কিছু না। বল কি? কিছু না, আমি যে স্বচক্ষে একটী লোককে জানালায় উঁকি দিতে দেখিলাম। শ্রীশচন্দ্রের সন্দেহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাব ইন্দ্রাণীকে বুঝিতে না দিয়া বলিলেন—লোকটাকে আমি বাহির হইতে দেখিয়া আসি। চঞ্চলকণ্ঠে ইন্দ্রাণী—কিছু না, তোমার মিছে সন্দেহ—এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্রের হাত ধরিল। শ্রীশচন্দ্রের সন্দেহাগ্নি দ্বিগুণ মাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ইন্দ্রাণীর হাত ছাড়াইয়া তখনি বাহিরে গেলেন। এ দিকে কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্রাণী আলমারি খুলিয়া কতকগুলি নোট লইয়া কম্পিতপদে সেই কুঞ্জবনে প্রবেশ করিল, দূর হইতে শ্রীশচন্দ্র সব দেখিলেন, প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীশচন্দ্র ইন্দ্রাণীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্রাণী ও যুবকটী কুঞ্জবন হইতে বাহির হইল। যুবক কি যেন বলিয়া বাগানের বাহিরে চলিয়া গেল। ইন্দ্রাণী বাড়ীর ভিতর গেল। শ্রীশচন্দ্র

সব লক্ষ্য করিলেন। হস্তে বন্দুক ছিল, ইচ্ছা করিলে যুবকের মস্তকের খুলি উড়াইয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করিলেন না। অসহনীয় অব্যক্ত যাতনা নীরবে বক্ষে চাপিলেন। আজ তাহার মনে হইল এ সংসার দেবতার রচনা নয়, ইহা দৈত্যের কল্পনারও অতীত; এমন সুন্দর কান্তি, এমন বিমল জ্যোতিঃ, এমন মাধুরী মাখান হাসি, ইহাতেও এত কুটিলতা, ইহাতেও এত অবিশ্বাস! ধিক্ প্রেম! ধিক্ সংসার! কাহাকে বিশ্বাস করিব? এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

"আমার মাথা ঘুরিতেছে, সমস্ত শরীরে কে যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, উঃ কি যন্ত্রণা! বলিয়া ইন্দ্রাণী শয্যার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। পার্শ্বে শ্রীশচন্দ্র বসিয়া বলিলেন—তাইতো যন্ত্রণা বাড়িল কেন? নাও, এই আর এক দাগ ঔষধ খাও। না গো—ও ঔষধে যেন নাক জ্বলিয়া যায়, যাতনা আরও বৃদ্ধি হয়। কে বলিল, পাগল না কি!—বলিয়া শ্রীশচন্দ্র একদাগ ঔষধ ঢালিয়া ইন্দ্রাণীকে খাওয়াইলেন। ইন্দ্রাণীও মলুম—বুক পুড়িয়া গেল—বলিয়া বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিল। শ্রীশচন্দ্র তীব্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—পরের বুকে আগুন জ্বালিয়া দিলে নিজের বুকেও অমনি করিয়া আগুন জ্বলে। ইন্দ্রাণী কাতর-

নয়নে শ্রীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি কার বুকে আগুন দিয়াছি? ঘন মেঘমালা বিতাড়িত বিদ্যুতের ন্যায় ভয়ঙ্কর ভাবে একটু হাসিয়া কর্কশকণ্ঠে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন—কাহার বুকে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছ জান না? ইন্দ্রাণী আবার শ্রীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল, সে চক্ষুতে কত প্রেম কত ভালবাসা শ্রীশচন্দ্র তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। শ্রীশচন্দ্র গর্জ্জিয়া বলিলেন—মৃত্যুর সময় মিথ্যা কথা বলিয়া পাপের বোঝা বাড়াইও না। তেমনি কাতর উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তেমনি কোমল-মধুরস্বরে ইন্দ্রাণী বলিল—আমি তো কই মিথ্যা কথা বলি নাই। শ্রীশচন্দ্র বলিলেন—মিথ্যা কথা বল নাই, অবিশ্বাসি, দ্বিচারিণী স্বামীর বুকে আগুন জ্বালাইয়া দেও নাই? ইন্দ্রাণী বিস্মিতা হইয়া বলিল—স্বামীর বুকে? শ্রীশচন্দ্র আর কঠোর বিকৃতস্বরে বলিলেন—হাঁ—আজ কুঞ্জবনে গোপনে কাহার সহিত দেখা করিতেছিলে?

"ইন্দ্রাণী বলিল—ও তাই আমাকে সন্দেহ করিয়াছ? শ্রীশচন্দ্র বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন—সন্দেহের আর অপরাধ কি? এখনও সত্য কথা বলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, মৃত্যুর বেশী বিলম্ব নাই, আমি তোমাকে ঔষধ বলিয়া বিষ

দিয়াছি। ইন্দ্রাণী গম্ভীরস্বরে বলিল—তাহাতে আমার দুঃখ নাই, তুমি বলিলে আমি নিজ হস্তে বিষ খাইতে পারিতাম, যদি তোমার সন্দেহই হইয়াছিল, তবে আমাকে কেন মরিতে বলিলে না, আমি নিজে নিজেই মরিতাম—কেন মিথ্যা সন্দেহে ভগবানের চরণে অপরাধী হইলে? শ্রীশচন্দ্র বলিলেন—পাপীয়সি! ভগবানের পবিত্র নাম তোমার ও পাপমুখে শোভা পায় না। আমি তো পাপী; পাপী না হইলে, এ সুখের সংসারে এ যন্ত্রণা কেন পাইব?. জান না ইন্দ্রাণী—জান না, আমার বুকে যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছ, শত সহস্র কেন, কোটী কোটী নরকে সে অগ্নি নাই; আমার আবার পাপে ভয় কি? আমার আবার নরকে ভয় কি? ইন্দ্রাণী কাতরকণ্ঠে বলিল—তুমি মিথ্যা সন্দেহে এ দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ; আমি সত্য বলিতেছি আমি নির্দ্দোষী; শ্রীশচন্দ্র তীব্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—পাপীয়সি তুমি নির্দ্দোষী? ইন্দ্রাণী বলিল—হাঁ। আমি নির্দ্দোষী—সহস্রবার নির্দ্দোষী। ভগবান যেরূপ সত্য ও পবিত্র—আমিও সেইরূপ পবিত্র; তুমি যাহাকে কুঞ্জবনের ভিতর দেখিয়াছিলে, সে আমার দাদা প্রফুল্লকুমার।

"কি বলিলে, ইন্দ্রাণী সত্য নাকি? তবে কি আমি

তোমাকে মিথ্যা সন্দেহে বিষ দিয়াছি। হাঁ! মিথ্যা সন্দেহে—তুমি মহাপাপী, নরাধম—বলিয়া একটী কৃশকান্তি যুবক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া দেখিল সম্মুখে প্রফুল্লকুমার। ইন্দ্রাণী কাতরকণ্ঠে বলিল—দাদা তুমি মিথ্যা সন্দেহ করিতেছ—ওঁর কোন দোষ নাই, আমি নিজে বিষ খাইয়াছি। শ্রীশচন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে বলিল—না, প্রফুল্লবাবু আমি স্ত্রী হত্যাকারী নারকী। সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমার স্বর্ণ প্রতিমাকে আমি স্বহস্তে বিষ দিয়াছি—জান না প্রফুল্লবাবু জান না—আমি ঔষধ বলিয়া বিষ খাওয়াইয়াছি। সরলা অবলা আমার কথা বিশ্বাস করিয়া সেই বিষ সুধা বলিয়া পান করিয়াছে। প্রফুল্ল কাঁদিয়া বলিল—কাহারও দোষ নয়, এ দোষ আমার—আমি কেন লুকাইয়া টাকা চাহিতে আসিয়াছিলাম—তোমার কাছে চাহিতে আমার বড় লজ্জা করিয়াছিল, অথচ সম্মুখে কারাগার, তাই অনন্যোপায় হইয়া ইন্দ্রাণীর নিকট টাকা লইতে আসিয়াছিলাম। হায়! হায়! এই গোপন করিতে গিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলাম। ইন্দ্রাণী কাতরকণ্ঠে বলিল—দাদা কাঁদিও না। এ সময় চোখের জল কেন? আমার সময় হইয়াছে, আমি এইবার যাইব,

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া বলিল—নাথ! আমি তোমার দাসী, তোমার কোন দোষ নাই। এ ভ্রান্তি জগতে ঘটিয়া থাকে; তোমার কাছে যদি আমি সমস্ত গোপন না করিতাম, তাহা হইলে এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না। কেহ যেন স্বামীর নিকট কখনও কিছু গোপন না করে—গোপন করার ফল বড় বিষময়। লুকান কাজ একটাও ভাল নয়! আপনার দেবতার অজ্ঞাতে কোন কাজ করিতে নাই। আমি তাই করিয়াছি বলিয়া এই প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে আমার—আর কোন দুঃখ নাই—দুঃখ তোমায় ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে; আমি যে তোমার মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া যাইতে পারিলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। তাই বলিতেছি, একবার তেমনি করিয়া তেমনি সাদরে ইন্দ্রাণী বলিয়া ডাক—আমি তোমার চরণ ধূলা লইয়া সুখে মরি।—ইন্দ্রাণীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে হাত বাড়াইয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইল। অনুতাপদগ্ধ ব্যাকুল শ্রীশচন্দ্র "ইন্দ্রাণী" বলিয়া ইন্দ্রাণীর বুকের উপর পড়িলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সতী-লক্ষ্মী, সরলা ইন্দ্রাণী সতীলোকে প্রস্থান করিল।

"ইহার পর হইতে আর কেহ শ্রীশচন্দ্রকে দেখিতে পায় নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে অন্ধকার রাত্রে ৪।৫ খানি

গ্রামের লোকে শুনিতে পায়—কে যেন নিকটস্থ শ্মশানে হৃদয়-বিদারক স্বরে গগন বিদীর্ণ করিয়া ডাকিতেছে—"ইন্দ্রা! ইন্দ্রাণি!"



প্রথম পত্র।

নির্ঝরিণীর সহিত ফুলশয্যার রাত্রিতে যখন প্রভাত-কুমারের প্রথম কথা হয়, তখন সে নির্ঝরিণীকে প্রত্যহ পত্র লিখিতে অনুরোধ করে। নির্ঝরিণী স্বীকারও করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহ কাটিল, তবুও নির্ঝরিণীর পত্র আসিল না। প্রভাত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারি পৃষ্ঠাপূর্ণ একখানি প্রেমপত্র উৎফুল্ল হৃদয়ে—অনেক সোনার স্বপন মানস নয়নে দর্শন করিয়া—অতি সন্তর্পণে একদিন বৈকালে মোড়ের ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিল।

মধ্যাহ্নে যখন নির্ঝরিণী পিত্রালয়ে হাসিয়া খেলিয়া ছোট ভাই, বোন্, দিদি প্রভৃতির সহিত ভাত লইয়া কাড়াকাড়ি, ছড়াছড়ি করিতেছিল, এমন সময় প্রভাত

কুমারের সেই সযত্ন-রঞ্জিত লিখিত খামের চিঠিখানি পৌঁছিল। পিয়ন বাহিরে পত্র লইবার জন্য ডাকা-ডাকি করিতেই নির্ঝরিণীর ছোট ভাই নলিন্ ছুটিয়া গিয়া পত্রখানি আনিয়া নির্ঝরিণীর হাতে দিল। নির্ঝরিণীর বুক কাঁপিতে লাগিল। (বলা বাহুল্য সে স্বামীর চিঠি বুঝিতে পারিয়াছিল) লজ্জায় তাহার দুই চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল। চিঠিখানি দেখিতেও সাহস হইল না কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। দৌড়িয়া গিয়া তাহার শয়ন গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার হাতে যে তখন উচ্ছিষ্ট ছিল তাহা তাহার স্মরণেই আসিল না। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া—ফেলিল ; ঠিক এমন সময়ে, কার চিঠি, বরের চিঠি বুঝি, বলিতে বলিতে তাহার দিদি প্রভৃতি সকলেই সেই দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। নির্ঝরিণীর চিঠিখানি আর পড়া হইল না, বা পড়িবার সাহসও হইল না। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া প্রভাত কুমারের বড় সাধের, বড় আদরের পত্রখানি জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। কে জানে সেই সময় তাহার হাতখানি কেন কাঁপিয়া উঠিল। সরলা নির্ঝরিণী বুঝিল না—সামান্য কারণেও পুরুষের চঞ্চল মন সব সময় সত্য কারণ উপলব্ধি না করিয়া মিছামিছি একটা ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়া—ফেলে।

সেই সঙ্গে সে তাহার সুখের পথের প্রথম কণ্টক সৃজন করিল।

এ দিকে প্রভাত প্রত্যহ দুইবার করিয়া ডাকের সন্ধান লইতে লাগিল; পিয়ন আসিলেই প্রভাত সকলের আগেই দৌড়িয়া যায়; অনেকেরই চিঠি আসে, কিন্তু প্রভাতকুমার যাহার চিঠি চায় তাহার চিঠি আসে না। পিয়নের উপর প্রভাতের বড় রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু এ অবস্থায় আমরা প্রভাতকে দোষী করিতে পারি না—মানবের স্বভাবই এইরূপ। আশায় আশায় অনেক দিন গেল—তবুও—নির্ঝরিণীর পত্র আসিল না। এবার নির্ঝরিণীর উপর প্রভাত কুমারের বড় রাগ হইল। সে আর নির্ঝরিণীকে ভালবাসিবে না,আর তাহার মুখ দেখিবে না—প্রতিজ্ঞা করিল ও অন্য বিবাহ করিয়া নির্ঝরিণীকে জব্দ করিবে তাহাও মনে মনে স্থির করিল। প্রভাতকুমারের মনে হইতে লাগিল,চিঠি না লিখার কারণ আর কিছুই নয়—হয়ত নির্ঝরিণী তাহাকে পছন্দ করে না, বা ভাল বাসে না। নির্ঝরিণীর চিঠি পাইবার যত বিলম্ব হইতে লাগিল—প্রভাতকুমারের হৃদয়ের আগুন ক্রমেই তত বাড়িতে লাগিল। সংসার অনভিজ্ঞ অর্বাচীন যুবক জানিত না, দশম বৎসরের বালিকা একদিনে স্বামীকে

স্বামী বুঝিয়া ভালবাসিতে পারে না, এরূপ ভালবাসাও নিতান্ত অসম্ভব ; বালিকা এক দিনেই আপনার ভবিষ্যত বুঝিয়া লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না ; হৃদয়ের সাধ থাকিতেও হৃদয় খুলিয়া ভালবাসার কথা বলা বা হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া পত্র লেখাও অনেক সময় সম্ভব পর নয়। নির্ঝরিণীরও লজ্জা বশতঃ আজ লিখিব কাল লিখিব করিয়া আর পত্র লেখা হইল না।

একদিন দুইদিন করিয়া বৎসর কাটিল, প্রভাত কুমারের হৃদয়ের সেই অলীক বিশ্বাস বাড়িল বই কমিল না। পিতামাতা বুঝিলেন, পুত্রের ভবিষ্যত দাম্পত্য সুখ তাহারা নষ্ট করিয়াছেন। প্রভাতকুমার মায়ের বড় আদরের ছেলে। প্রভাতের মাতার প্রভাত ভিন্ন আর কোন সন্তানাদি ছিল না। সে একদিন মাতাকে বলিল, আমার অন্য বিবাহ দাও নতুবা আমি গৃহে থাকিব না। মাতা অনেক বুঝাইতেন, চঞ্চলমতি যুবক কিছুতেই বুঝিত না। সময় বুঝিয়া একদিন প্রভাতের মাতা পুত্রকে বলিলেন, "বাবা! যাহার সহিত বিবাহ দিয়াছি তাহাকে কি ভাসাইয়া দিব? সে বালিকা—তাহার কি অপরাধ বাবা? এখানে আসিলেই সব সারিয়া যাইবে, আমি এই মাসেই বৌমাকে আনিব।" প্রভাতকুমার বলিল,—

দেখ মা, আমার স্পষ্ট কথা শোন, আমি এই বিবাহে সুখী নই, আমার অন্য বিবাহ দিতে পার দাও, নতুবা যেমন আছি সেই ভাল। ও বউ আনিলে নিশ্চয়ই আমি বাটী পরিত্যাগ করিব, এই বলিয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। মাতা পুত্রের ভাব দেখিয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। ভাবিলেন, আহা! সরলা বালিকার কি অপরাধ? ভগবান্ এ কি করিলে? প্রভাতের সুমতি দাও।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—এখানে সে কথাটা বলা প্রয়োজন। প্রভাতকুমারের বাড়ীর পার্শ্বে রামহরি বসু নামে একজন দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। তাহার একটী মাত্র কন্যা ছিল। তাহার নাম অনুপমা—অনুপমার বয়স বার কি তের বৎসর হইবে। অবস্থার অস্বচ্ছলতা বশতঃই অনুপমার পিতা অনুপমার বিবাহ এ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। আজ কাল আমাদের ঘরে ঘরে এই অবস্থা; অনেক দরিদ্র ব্যক্তি এইরূপ বিবাহ যোগ্যা বয়স্থা কন্যা লইয়া বিব্রত; কি করিবে সমাজের অবস্থা যেরূপ—ভাল ঘরে বিবাহ দিতে হইলে, বহু টাকার প্রয়োজন। দরিদ্রের পক্ষে যে কি ভয়ানক, যাহার বিবাহ-যোগ্যা কন্যা গৃহে, তিনি সম্যক অবগত আছেন।

অনুপমার পিতা উপস্থিত বড়ই বিব্রত ; কন্যাকেও গৃহে রাখিতে পারেন না। ভাল পাত্রও মিলে না। স্বামী স্ত্রীর মুখে অন্ন উঠে না, অনুপমাই, তাহাদের এখন আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতেন, এখন সে বিবেচনারও অবসর নাই। যাহা হউক যেরূপ হউক কোনএকটী পাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন। অনুপমা দেখিতে মন্দ নহে।

প্রভাতকুমার প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাড়ীর ছাদে বসিয়া আপন ভবিষ্যত কত ভাবে ; কিন্তু ভাবিয়া কুল পায় না। আকাশে যেমন অনন্ত মেঘ,—একের পর একে আকাশ ছাইয়া ফেলে ; সেইরূপ প্রভাতকুমারেরও হৃদয়গগন চিন্তায় আচ্ছন্ন, ক্ষণকাল ও অশান্তির বিরাম নাই ; তাহার চিন্তার অন্ত নাই। একদিন প্রভাতকুমার সন্ধ্যায় ছাদে বসিয়া আছে, আকাশের চাঁদ হাসিতেছে, মনচোরা মধুপবন চাঁদের অময়িকর হরণ করিয়া জগৎময় ছড়াইয়া দিয়া সংসারতাপিত জীবকে একটু প্রফুল্ল করিতেছে। বোধ হয় প্রভাতও সে অমিয় কিরণে সুখী হইত ; কিন্তু কই প্রভাত কুমারের তো হৃদয় জ্বালা জুড়াইল না,—তাহার অনন্ত চিন্তা অবিরাম গতিতেই চলিয়াছে। পাশের ছাদে অনুপমা বসিয়া আকাশ পাতাল কি ভাবিতেছিল। তাহার মনে

হইতেছিল, আমি জন্মাইলাম কেন? আমি না জন্ম গ্রহণ করিলে তো পিতা মাতার হাসি মুখ ভার হইত না—হে জগদীশ্বর! হে লজ্জা নিবারণ! হে তাপহারী মধুসূদন! আমায় তোমার চরণে স্থান দাও। আমি আমার ফুটোন্মুখ এই অনন্ত আশা-ফুল্ল যৌবন লইয়া তোমার চরণে ঝরিয়া যাই। আর যদি তা না হয় আমার উপায় কর, পিতা মাতা নিশ্চিন্ত হউন। সে সময় মলয় পবন পূর্ণিমার চাঁদকে লইয়া বড় রঙ্গ করিতেছিল। কোথা হইতে সব কাল কাল মেঘগুলিকে ডাকিয়া আনিয়া চাঁদের হাসিমুখ ভার করিয়া দিতেছিল। সমীরণের রঙ্গ দেখিয়া থাকিয়া থাকিয়া মেঘের আড়াল হইতে চাঁদ একবার হাসিতেছিল। সেই সময় প্রভাতকুমার শিশির-স্নাত যুঁই ফুলের মত অশ্রুসিক্ত বালিকাকে দেখিল। প্রভাতকুমার জগৎ ভুলিয়া গেল; সে যেন এরূপ শোভা আর দেখে নাই; অনিমেষ নয়নে সেই অনুপমার অনুপম রূপ রাশি দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গেল। তাহার মনে হইতেছিল, অনুপমার রূপ দেখিয়া যেন চাঁদ তাহার মেঘের ঘোমটা টানিয়া দিয়া মুখ লুকাইয়া ঘোমটার আড়াল হইতে উঁকি দিয়া সে অনিন্দ্য-রূপসুধা পান করিতেছিল। ঠিক সেই সময় অনুপমার মনে হইতেছিল, চাঁদ বুঝি তার দুঃখ বুঝিয়া

বিষণ্ণ বদনে সরিয়া যাইতেছে। এমন সময় মা ডাকিলেন : অনুপমা "যাই মা" বলিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নীচে নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতকুমারেরও জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্ত্তন হয়। নির্ঝরিণীর স্বভাবও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বিবাহ প্রায় তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে এখন সে আর দশম বর্ষীয়া বালিকা নহে, এখন নির্ঝরিণীর ত্রয়োদশ বর্ষীয়া পূর্ণ কৈশোরী। এখন তাহার ভাল মন্দ বুঝিবার অনেকটা ক্ষমতা হইয়াছে এবং স্বামীর প্রতি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ-সূত্রে অনুরাগও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিন বৈকালবেলা ছাদে বসিয়া অনেক কাটিয়া কুটিয়া কম্পিতহস্তে আজ এই তিন বৎসরের পর প্রভাত কুমারকে পত্র লেখার জন্য অনেক ক্রটী স্বীকার করিয়া—অতি নম্রভাবের একখানি পত্র লিখিল ; কিন্তু অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে, সুখ কিছুতেই আসে না। যথা সময়ে পত্রখানি পৌঁছিল, প্রভাতকুমার সে পত্র ঘৃণায় পড়িল না। পত্র খানি পড়িলে হয়ত ভ্রম অনেকটা দূর হইত। প্রভাতকুমারের তখন অনুপমার অনুপম রূপ-জ্যোতিঃতে হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। সে গগনপটে প্রথম রবিকিরণের ন্যায় নির্ঝরিণীর মূর্ত্তি প্রকাশ না

হইতেই গাঢ় মেঘে তাহা আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অনেক কথা কাটাকাটির পর, অর্থ-লোলুপ প্রভাতের পিতা পুনরায় প্রভাতের বিবাহের স্থির করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, দোষ কি? অনেকেই তো দুইটী বিবাহ করিয়া থাকে. তাহাতে পুত্রও সে বিবাহে সুখী নয়, কিছু অর্থও পাওয়া যায়, পরিশেষে ভাবিলেন, ইহাতে পুণ্য ভিন্ন পাপ নাই। কেন না বিপন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের কুল রক্ষা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য কন্যাদায়গ্রস্ত রামহরি বসুই প্রভাতের সহিত কন্যার বিবাহের স্থির করিয়াছিলেন।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিল। প্রভাতকুমারের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। সে দিনরাত্রিই কেবল অনুপমার সুন্দর মুখখানি ভাবিতে লাগিল। এ বিবাহে সকলেরই আনন্দ। প্রভাতের মাতাও নিমরাজি গোছ হইয়াছেন,—কি করিবেন, প্রভাতের পিতারও মত, আর পুত্রেরও ইচ্ছা—কাজেই তাঁহার অমত করিবার উপায় নাই; কেবল একজনের এ আনন্দেও আনন্দ নাই—সে আর কেহই নয়—প্রভাতের খুল্লতাত ভ্রাতা ধীরেন্দ্রমোহন, সে কেবল ভাবে আহা! বালিকা, তাহার কি অপরাধ? কেন দাদা তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। তাহার উপায় কি হইবে? ধীরেন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের

ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিল, আর সময় নাই, বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী। ধীরেন্দ্রমোহন সকলকেই অনেক করিয়া বুঝাইল। তাহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নির্ঝরিণীকে এক পত্র লিখিল, পত্রে লেখা ছিল, আপনার স্বামী অন্য বিবাহের জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছেন এখন আপনি ছেলে মানুষ নহেন। আপনার ভাল মন্দ আপনার হাতে, যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন। এ ঘোর বিপদের সময় আপনার এখানে উপস্থিত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। পত্র যথা সময়ে পৌঁছিল। নির্ঝরিণী পত্র পড়িয়া অনেক কাঁদিল, আপনার অদৃষ্টকে আপনার বুদ্ধিকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়া পত্র খানি তাহার মাতার নিকট দিল। পত্র পড়িয়া মাতাও ভয়ানক ব্যস্ত হইলেন, কর্ত্তাও শুনিলেন—নির্ঝরিণীর দাদাও শুনিল। বাড়ীতে হঠাৎ বৈশাখী ঝড়ের মত একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। নির্ঝরিণীর দাদা প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ বিবাহ যদি বন্ধ করিতে না পারেন, তবে তিনি আর দেশে ফিরিবেন না।

কাল বিবাহ, নির্ঝরিণীর দাদা প্রভাতের নিকট, প্রভাতের পিতার নিকট অনেক কাকুতি মিনতি

করিলেন। প্রভাতের পিতা বড় কঠিন লোক, তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে আসিলে হইত—এখন আমি কি করিব! ভদ্র লোককে কথা দিয়াছি,—উল্টাইতে তো পারি না" ইত্যাদি নানা কথায় নির্ঝরিণীর ভ্রাতার মুখ বন্ধ করিয়া বিদায় দিলেন, নির্ঝরিণীর ভ্রাতা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিলেন। কলিকাতায় তাঁহার অনেকগুলি সহপাঠী ছিল,সকলকেই তাঁহার এই বিপদের কথা জানাইলেন। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল, যাহাতে এ বিবাহ না হয় তাহাই করিবে। তখনই কি একটা পরামর্শ হইয়া গেল।

কি সর্ব্বনাশের কথা! আজ বিবাহ, বর নাই—ভদ্রলোকের কন্যার জাতি যায়—প্রভাতের পিতা পুত্রের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পুত্রের কোন সন্ধান পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। লগ্ন উপস্থিত, রামহরি বাবু চক্ষে ধুতুরাফুল দেখিতেছিলেন। এ দিকে একজন নিরীহ ভদ্রলোকের জাতি যায়, ও অপর দিকে প্রভাত নাই। প্রভাতের পিতা বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। এত টাকার লোভও পরিত্যাগ করিতে পারেন না—অথচ প্রভাতকে পাওয়া যাইতেছে না—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সেই লগ্নে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্র মোহনের

সহিত অনুপমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ইহাকেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

এ দিকে একটী পুরাতন গলির ভিতর কোন একটী জীর্ণ কক্ষে প্রভাতকুমার সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় শায়িত, পার্শ্বে অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না একটী যুবতী বসিয়া বাতাস করিতেছে। যুবতী অনিমেষ-লোচনে প্রভাত-কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। হৃদয়ের কি ভাব জানি না, কিন্তু দর্শনলিপ্সা যেন মিটিতেছে না। প্রভাতকুমার ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল। সে স্বপ্নে দেখিতেছিল, অনুপমার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে—কিন্তু অনুপমা কাঁদিতেছে—পার্শ্বে ধীরেন্দ্র, তাহারও চক্ষে জল; প্রভাতকুমারের বিবাহে তত আনন্দ হইতেছিল না। সব আনন্দই যেন ভাসা ভাসা—অস্থায়ী ভাবের তরঙ্গ একটির পর একটি হৃদয়ে মিলাইয়া যাইতেছিল। এমন সময় আকাশে পূর্ণজ্যোতির মত কি এক অপূর্ব্ব আলো তরঙ্গ উত্থিত হইল। ক্রমে সেই জ্যোতির মধ্য হইতে একটী কিশোরী সুন্দরী হাসিতে হাসিতে একছড়া ফুলের মালা আদর করিয়া প্রভাতের গলায় পরাইয়া দিল, প্রভাতেরও হাত যেন ইচ্ছা কি অনিচ্ছাসত্বে সে অনুভব করিতে পারিল না) আপন গলার মালাছড়াটী সেইপ্রস্ফুটিত কুসুমবৎ বালিকার

গলায় পরাইয়া দিল। প্রভাতকুমার সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বালিকাকে সে যেন কোথায় দেখিয়াছে। ভাল মনে পড়িতেছে না। এমন রূপ যেন অনুপমারও নয়। আহা! কি স্বর্গীয় দেবী মূর্ত্তি। ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল, বালিকার মুখ যেন, নির্ঝরিণীর মত। জাগ্রত হইয়াও সবিস্ময়ে দেখিল, পার্শ্বে সেই স্বপ্ন-দৃষ্টা বালিকা—প্রভাতের মনে হইতেছিল, সে যেন তখনও স্বপ্ন দেখিতেছে। সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা? বালিকা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল—"আমায় চিন্তে পাচ্ছ না? আমি নির্ঝরিণী"।

"তুমি নির্ঝরিণী' আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? বালিকা লজ্জাবনত হইয়া বলিল, না স্বপ্ন দেখ্‌ছেন না।

প্রভাত। আমি কোথায়?

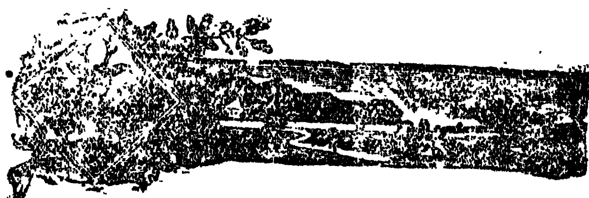
নির্ঝরিণী। আমাদের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে।

প্রভাত। আমি কেমন কোরে এখানে এলাম?

নির্ঝরিণী। আপনি আপনার কোন বন্ধুর বাড়ীতে খেলা করিতে ছিলেন, আমার দাদা সেখান থেকে কি যেন একটা ওষুধের সাহায্যে অজ্ঞান ক'রে আপনাকে এনেছেন। আমি আপনার চরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমায় মার্জ্জনা করুন।

বালিকা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রভাতের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল। প্রভাতকুমার অতি যত্নে বালিকার দুই হস্ত ধরিয়া সেই ফুল্লারবিন্দনিন্দিত অঙ্গ আপন অঙ্কে মিশাইল অশ্রুসিক্ত-কণ্ঠে প্রভাতকুমার বলিল, নির্ঝরিণী আমি নিতান্ত মূর্খ, তাই তোমা হেন রত্নেরও অযত্ন করিয়াছিলাম।

নির্ঝরিণীর সে আদর হৃদয়ে রাখিবার আর স্থান হইল না, আদরে প্রভাতের কণ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—দোষ কারু নয়, দোষ শুধু সেই প্রথম-পত্রখানির।



শিক্ষিত।

হরিপ্রসন্ন কলিকাতায় হেড্‌মাষ্টারি করিয়া ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকায় স্ত্রী চঞ্চলাকে লইয়া একটী ক্ষুদ্র সুখের সংসার পাতিয়া ছিলেন। পত্নী চঞ্চলা একটু চঞ্চলাই ছিল, কেননা চঞ্চলার সদ্যউন্মেষিত যৌবন তাহাকে একরূপ অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। চঞ্চলা—সুন্দরী; কোঁকড়া কোঁকড়া কাল কাল কেশগুচ্ছ চঞ্চলার পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত; চুল-বাঁধিবার সখ্‌ তাহার বড় ছিল না। স্বামী স্কুলে যাওয়ার পর, সমস্ত দুপুর বেলা চঞ্চলা—বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ, গিরীশ ইত্যাদি গ্রন্থাবলী লইয়া একরূপ কাটাইয়া দিত। চঞ্চলার বর্ণ গৌর, হাত পাগুলি রাঙ্গা পদ্মের মত, ঠোঁট দুখানি রাঙ্গা টুকটুকে ক্ষুদ্র, উচ্চ-বক্ষ, ক্ষীণ-কটী, কোমল

শরীর, জগতের সব সৌন্দর্য্য যেন তাহাতেই মিশিয়া রহিয়াছে। চঞ্চলা রাস্তার ধারে গবাক্ষের খড়খড়ি খুলিয়া গাড়ী, ঘোড়া, লোকজন দেখিয়া দেখিয়া ভাবিত, এ অনন্ত জনস্রোত ফুরায় না কেন? আবার চারিটা বাজিবার পূর্ব্বেই, রান্না ঘরে যাইয়া স্বামীর জন্য দু চারি-খানা পরোটা, একটু তরকারী ও মোহন ভোগ তৈয়ারী করিয়া শয়নকক্ষে কার্পেটের আসনখানি বিছাইয়া জলখাবার সাজাইয়া রাখিত। বারান্দায় কলসী করিয়া জল আনিয়া ঘটীর উপর গামছা ইত্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিত। হরিপ্রসন্ন গৃহে আসিয়া দেখিতেন, তাঁহার গৃহ-লক্ষ্মী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। ছুটীয়া গিয়া চঞ্চলা স্বামীর চাপকানের বোতাম, জুতার ফিতা ইত্যাদি সযত্নে খুলিয়া দিত। হরিপ্রসন্ন বালিকা-পত্নীর যত্নে তন্ময় হইয়া সেই সুন্দর মুখে আবেশভরে শতসহস্র চুম্বন করিতেন। দিন সুখেই কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে ভূপেন্দ্র নামক একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক হরিপ্রসন্ন বাবুর নিকট এফ,এ, ক্লাসের পড়া বুঝিয়া লইতে আসিল। তারপর সে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর প্রায়ই আসিত; হরিপ্রসন্ন বাবু ভ্রাতৃ-স্নেহে, সযত্নে তাহাকে পাঠ্য বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। ভূপেন্দ্র বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্র, তাহাকে যে শিক্ষিত

হরিপ্রসন্ন ভালবাসিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভূপেন্দ্রের সহিত ক্রমে ক্রমে চঞ্চলার ও পরিচয় হরিপ্রসন্ন করিয়া দিলেন। কাজ কর্ম্ম সারিয়া চঞ্চলা মধ্যে মধ্যে স্বামীকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া ভূপেন্দ্রের পড়া শুনিত। হরিপ্রসন্ন দরজার দিকে চাহিয়া চঞ্চলাকে দেখিলে বলিতেন, এস না, ভিতরে এস, বস, লজ্জা কি? ভূপেন তোমার ছোট দেবর তুল্য। চঞ্চলাও বাহিরে একাকী থাকিতে, তত সাহস করিত না কাজেই ধীরে ধীরে আসিয়া হরিপ্রসন্ন বাবুর সম্মুখে মাটীতে বসিত। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে চঞ্চলার সঙ্কোচ দূর হইল। ক্রমে ভূপেন্দ্র ও আর লজ্জা করিত না। নির্দ্দোষ হাসি-ঠাট্টার-গল্প ভূপেন্দ্রের সঙ্গে চঞ্চলার চলিত। হরিপ্রসন্ন তাহাতে কিছুই বলিতেন না, বা তাঁহার মনে কোনরূপ বিরুদ্ধভাবের উদয় হইত, না। কোনকোন দিন হরিপ্রসন্ন কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে গিয়া রাত্রি করিয়া আসিতেন; সেদিন ভূপেন্দ্র নিয়মিত সময়ে আসিয়া চঞ্চলার সহিত গল্প করিত, পড়া শুনা আর হইত না। ভূপেন্দ্রের মন যেন দিন দিন কেমন হইয়া আসিতে লাগিল। তাহা সে নিজেই ভালরূপ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এই চাঞ্চল্য বাসায়

ঝি শ্যামের মা বেশ মনে মনে বুঝিল। একদিন সন্ধ্যায় হরি-প্রসন্ন বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন। ভূপেন্দ্র আসিয়া দেখিল, হরিপ্রসন্ন বাসায় নাই। সে একখানি বঙ্কিমের নভেল লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। এমন সময় রান্না শেষ করিয়া চঞ্চলা আসিয়া বলিল "কি ঠাকুর পো কতক্ষণ এসেছ ?" কম্পিত কণ্ঠে "অনেক্ষণ এসেছি" বলিয়া ভূপেন্দ্র আরও কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মুখে আসিল না। বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া কাঁপিতেছিল, এমন সময় জানালা দিয়া একটা দমকা হাওয়া আসিয়া আলো নিভাইয়া দিল। মানসিক অদম্য চাঞ্চল্যে ভূপেন্দ্র চঞ্চলার হাত ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে অস্পষ্ট-স্বরে বলিয়া উঠিল "চঞ্চলা আমি তোমায় ভালবাসি," একটি দারুণ মানসিক উদ্বেগ হঠাৎ প্রকাশ হইলে মানুষ যেমন আপনি শ্রান্ত হইয়া পড়ে,, ভূপেন্দ্র বহু কষ্টে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। চঞ্চলারও কোন কথা ফুটিল না, সে অপ্রত্যাশিত ঝটি-কায় কম্পিত লতাটির মত থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে ভূপেন্দ্র চঞ্চলার হাত ছাড়িয়া দিল। তৎক্ষণাৎ চঞ্চলা সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। ভূপেন্দ্র বাটী ফিরিয়া গেল। পরদিন হইতে ২।৩ দিন ভূপেন্দ্র আর

হরিপ্রসন্নের বাটীতে আসিল না। এই ঘটনার পর হইতে চঞ্চলার কি যেন একটা অজানিত চিন্তায় সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া দিল; সে নিজের মনের ভাব নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, কিন্তু এই অজানিত চিন্তায় সে একটা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল হরিপ্রসন্ন এ সব লক্ষ্য করিয়াও লক্ষ্য করিলেন না। সমস্ত দিন রাত ভবিয়া ভাবিয়া দুই তিনদিন পরে কম্পিত হস্তে চঞ্চলা ভুপেন্দ্রকে অনেক কষ্টে এক পত্র লিখিল— আমি তোমার জন্য ব্যাকুল, তুমি অতি অবশ্য কল্য আসিবে। চিঠিখানা সন্তর্পণে ঝিকে দিয়া বলিল, "ঝি, এ পত্রখানা ভুপেন বাবুকে দিয়ে আস্‌তে পারবি?" ঝি বলিল, "পারবো না কেন?" কিন্তু মনে মনে ভাবিল, এ ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানষিমী করতে আছে? এরা তো ধরা পড়বেই? মাঝে হইতে আমি কেন দোষী হই? বাবুকে এই চিঠিখানা আগেই দেখাতে হইবে।— ভাবিয়া চিঠিখানি লইয়া স্কুলে গেল। হরিপ্রসন্ন বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন ঝি? "এই চিঠিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন" বলিয়া ঝি চিঠিখানি হরিপ্রসন্নের হাতে দিল। হরিপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া ভাবিলেন বোধ হয় চঞ্চলা তাঁহাকেই চিঠি

লিখিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ভ্রম দূর হইল। এ কি সর্ব্বনাশ? ধীরচেতা যথার্থ শিক্ষিত হরিপ্রসন্ন ইহাদের পরিণাম ধীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মুখে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না; ভাবিলেন দোষ তাঁহারই, তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ হরিপ্রসন্ন ঝিকে চিঠিখানি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "চিঠিখানি ভূপেন্দ্রকে দিও।" ঝি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মুখে কোন কথা সরিল না, কিন্তু প্রাণে একটা দারুণ খট্‌কা বাঁধিয়া গেল। হরিপ্রসন্ন শরীর অসুস্থ বলিয়া ছুটী লইয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলেন। আত্মতত্ত্বান্বেষু হরিপ্রসন্ন নিজের ত্রুটীগুলি পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। অনবস্থিত চিত্ত যুবক যুবতীর সংযোগে বিষময় ফল ফলিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার স্ত্রীর প্রতি যতটুকু কর্ত্তব্য ছিল, তাহা তিনি করেন নাই। তিনি তাহাদের এই সুযোগ দিয়াছেন, এখন তাহাদের দোষ দিতে পারেন না। তথাপি তিনি আপনাকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিলেন—কেননা পত্রের মর্ম্মে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন তখনও তাহাদের অধঃপতন ঘটে নাই। এখনও ফিরাইবার পথ আছে। তিনি

সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে রাত্রি হইল। তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন, স্ত্রীকে কিছুই বলিলেন না বরং হাসিয়া গল্প করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। পরদিন স্বাভাবিক ভাবে স্কুলে যাইবার সময় বলিলেন "দেখ, আমার এক বন্ধুর বাটী নিমন্ত্রণ আছে, রাত্রিতে খুব সম্ভব আসিব না। আসিলেও রাত্রি অনেক হইবে. কেননা, ষ্টার-থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইব "এইরূপে স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া হরিপ্রসন্ন গোপনে বাড়ীর প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। সন্ধ্যার পরে 'ধীরে ধীরে ভূপেন্দ্র চঞ্চলার গৃহে প্রবেশ করিল। কেহই লজ্জায় কাহারও প্রতি চাহিতে পারিল না। দীপ্ত-আলোকে অন্ধকার হইতে হরিপ্রসন্ন সবই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তখনই তিনি সিঁড়িতে একটু একটু শব্দ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। চঞ্চলা দেখিলেন, সর্ব্বনাশ স্বামী ফিরিলেন যে। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ভূপেন্দ্র খাটের নীচে আশ্রয় লইল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই হরিপ্রসন্ন চঞ্চলাকে তেমনি আদর মাখা স্বরে বলিলেন, "আমার থিয়েটারে যাওয়া হইল না, মিছামিছি আর কেন রাত্রি-বাস পরের বাড়ীতে করি, এই ভাবিয়া বাটী ফিরিয়া

আসিলাম। রান্না হইবেনা জানিয়া ঝিয়ের নিকট কিছু খাবারও আনিতে দিয়াছি” বলিয়া ঝিকে ডাকিলেন। ঝি উপরে আসিলে, হরিপ্রসন্ন বলিলেন, “এই ঘরে দুই-খানি খাবার জায়গা কর” চঞ্চলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল “দুইখানা জায়গা কার জন্য ? “হরিপ্রসন্ন বলিলেন দেখি-তেই পাইবে।” ঝি কথিত মত দুইখানি জায়গা করিয়া খাবার দুই অংশে বিভাগ করিয়া দিল। হরিপ্রসন্ন বেশ ধীরভাবে খাটের নীচে তাকাইয়া ডাকিল, ভূপেন লজ্জা কি ? বেরিয়ে এস এই বলিয়া ভূপেন্দ্রকে মৃতবৎ খাটের নিম্ন হইতে হরিপ্রসন্ন টানিয়া বহিরে আনিল। চঞ্চলা আজ যেন পৃথিবীর সমস্ত স্থিরতা লইয়া পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় অচঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হরিপ্রসন্ন ভূপেন্দ্রকে একটী আসনে বসাইয়া “বলিলেন, খাও না ভাই লজ্জা কি ? দোষ তোমার কিছুই নয়। দোষ সম্পূর্ণ আমার। ভাই, যৌবনে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সে না বুঝিয়া পাপপথে অগ্রসর হয়। যাহাই হউক আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলাম।” ভূপেন্দ্র কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বহির হইয়া গেল। তখন ধীরে ধীরে চঞ্চলাকে নিকটে ডাকিয়া হরিপ্রসন্ন বলিলেন,—নারীর স্বভাবই চঞ্চল, তাহাতে যুবতীরা

সযত্নে রক্ষণীয়। তরুণবয়সে স্বামী বা আত্মীয়স্বজনের তাহাদের প্রতি সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমার এ কর্ত্তব্যহীনতা আজ তোমায় নষ্ট করিতে বসিয়াছে। যাহা হউক, তুমি এখনও আমাকে ভাল বাসিতে পার নাই। যদি ভূপেন্দ্রকে লইয়াই সুখী হও, আমি তোমাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিব। অনুতাপ-দগ্ধা বালিকা স্বামীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি বুঝিতে পারি নাই—আমাকে ক্ষমা কর" হরিপ্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন, "আমি অনেকক্ষণ তোমায় ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু তুমি বাস্তবিক কলঙ্কিণী না হইলে ও মনে মনে ভূপেন্দ্রের রূপ-মোহে-মুগ্ধ হইয়াছ, আমি তোমাকে কি বলিয়া গ্রহণ করিব ?" চঞ্চলা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া হরিপ্রসন্ন গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "তুমি অপরিণত বয়স্কা বালিকা, সংসারের কিছুই জাননা। আচ্ছা তোমাকে আমি মার্জ্জণা করিতে পারি, কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহা প্রতিপালন করিতে পারিবে?" এক নিশ্বাসে চঞ্চলা বলিল, "আমায় যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।" হরিপ্রসন্ন বলিলেন, "তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" চঞ্চলা বলিল, "কি প্রায়শ্চিত্ত করিব বল," হরিপ্রসন্ন বলিলেন, "তিনবৎসর

কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত লইয়া তোমাকে থাকিতে হইবে; আতপতণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া একসন্ধ্যা আহার করিবে। এক কাপড় অঙ্গে শুকাইয়া লইবে, পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, তৈল মাখিতে পাইবে না. কেশবিন্যাস করিতে পাইবে না। এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক যদি তিন বৎসর অতিবাহিত করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি সর্ব্বান্তকরণে মার্জ্জণা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিব।" মগ্নপ্রায় ব্যক্তির কূলপ্রাপ্তির ন্যায় সাগ্রহে চঞ্চলা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক পতি-পদ আনন্দ-অশ্রুনীরে সিক্ত করিতে লাগিল। চঞ্চলা চাঞ্চল্য বিসর্জ্জন দিয়া হাস্যমুখে তিনবৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে রত হইল। আর এদিকে সেই রাত্র হইতেই ভূপেন্দ্রকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। অনেকেই বলে, সে বিরাগী হইয়া বিন্ধ্যাচলে আছে। হরিপ্রসন্নের এই অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতার গুণে দুইটী পতিত চরিত্র পবিত্র হইল।"



ভুলোর খেলা।



মাখনলাল ঘোষ কোন সওদাগর আফিসে ৬০৲ টাকা বেতনে ক্যাসিয়ারিপদে কর্ম্ম করেন। এই সামান্য আয়ে কোনরূপে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। পত্নী চারুশীলা অতি নিপুনা গৃহিনী ছিলেন, তাঁহারই পরিচালন গুণে এই সামান্য আয়েও মাখনলালের বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। তাঁহার একটি বিবাহ যোগ্য কন্যা ও একটি ছোট পুত্র ছিল। বাল্যকাল হইতে মাখনলালের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যাইত, সে আগ্রহ প্রৌঢ় বয়সেও সমানভাবে তাহাকে অধিকার করিয়াছিল। অবসর সময়ে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র লইয়া অনেকটা সময় অতিবাহিত করিতেন। সখ করিয়া পাড়ার ২।১ জনের

ঠিকুজি কোষ্টিও প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাঁহার গনণার উপর সাধারণের একটা শ্রদ্ধা ছিল।

আজকাল কলিকাতায় তুলার খেলার একটা প্রবল হুজুক চলিতেছে, ইতর, ভদ্র অনেকেই খেলিতেছেন; কেহ বিশেষ কিছু লাভবান হইয়াছেন কিনা জানিনা, কিন্তু খেলা সমানভাবে চলিতেছে। অনেকে নিজেদের চলিত ব্যবসায় বন্ধ করিয়া এই ব্যবসায়ে মাতিয়াছেন। গলির মোড়ের পানওয়ালারা তুলার নম্বরের কাগজ দোকানে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রতি রাস্তায় ঘর ভাড়া লইয়া কতলোক এই খেলার আফিস খুলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি দোকানেই অসম্ভব ভিড়। সন্ধ্যার সময় অত ভিড় শুঁড়ির দোকানেও হয় না। সময় বুঝিয়া দু একজন ব্যবসায়ী জ্যোতিষী তুলার নম্বর ঠিক গণিয়া দিবেন অঙ্গীকারে বিজ্ঞাপন দ্বারা রাস্তা ছাইয়া ফেলিয়াছেন। ট্রামে, পথে, বাজারে, রেলে তুলার খেলার গল্প। চারি আনায় এক টাকা, একটাকায় আট টাকা, নয়টাকা, কলম পিসিয়া মাথা ঘামাইয়া এক মাসের রোজগার বিনা পরিশ্রমে একদিনে পাওয়া যায়, ইহা কি কম লাভের কথা? দরিদ্র দেশের লোক উন্মত্ত না হইবে কেন? শুনিয়াছি গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাও

বাড়ীর অভিভাবককে লুকাইয়া বেহারার মারফতে এই খেলা খেলিতেছেন।

মাখনলালকে অফিস হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় অনেকগুলি দোকানের সম্মুখ দিয়া আসিতে হইত। প্রথমে তাহার এ বিষয়ে লক্ষ্য ছিল না। একদিন ব্যাপারটা কি জানিতে আগ্রহ হওয়ায় ঐ রূপ একটা দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ দেখিলেন। এক হইতে দশ পর্য্যন্ত একটা সাইন বোর্ডে নম্বর লেখা রহিয়াছে; তাহার একপাশে কোন নম্বর এক টাকা, কোন নম্বরে পাঁচ টাকা, এমন কি কোন কোন নম্বরে ১০।১১ টাকা পর্য্যন্ত লেখা আছে। নম্বরের তাৎপর্য্য এই যে,—যে অঙ্কটি আমি মনোনীত করিলাম, সেই অঙ্কটি যদি সেই দিনে বিলাতে মার্চেণ্ট অফিস হইতে তুলার যে দর নির্দ্ধারিত হইবে তাহার শেষ অঙ্কটির সহিত সমান হয়, তাহা হইলে ঐ অঙ্কের লিখিত টাকা লাভ পাওয়া যাইবে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ দেখিয়া মাখনলাল বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার মাথার ভিতর তুলার নম্বর ঘুরিতেছিল। অনেকক্ষণ মাথা ঘামাইয়া, অনেক অঙ্ক কসিয়া একটা নম্বর স্থির করিলেন। পরদিন অফিস হইতে ফিরিবার সময় সাগ্রহে

অনুসন্ধান লইলেন, কোন্ নম্বর উঠিয়াছে! দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার মনোনীত নম্বর সে দিন মিলিল না। সে দিন তিনি আরও দ্বিগুণ উৎসাহে অনেক পরিশ্রমে পুনরায় নম্বর নির্দ্ধারিত করিলেন, সেবার তাঁহার নম্বর ঠিক্ হইল। ক্রমশঃই তাঁহার উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। তিনি প্রত্যহ একটা করিয়া নম্বর ঠিক করিতে লাগিলেন, এবং প্রায়ই সে নম্বর মিলিতে লাগিল। তিনি তুলার খেলা কখনও খেলেন নাই, কিংবা খেলিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি প্রত্যহ নম্বর নির্দ্ধারিত করিতেন, নম্বর মিলিলে তাঁহার যে আনন্দ উপস্থিত হইত, তাহা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু আফিমের নেশার মত নম্বর নির্দ্ধারণের জন্য প্রত্যহ ব্যাকুল হইতেন। রাত্রে দু এক জায়গায় টিউসনি ছিল, তারপর ফিরিয়া তুলার খেলার অঙ্ক লইয়া বসিতেন। কোন কোন দিন এই কার্য্যে অনেক রাত্রি হইয়া পড়িত, চারুশীলা বিরক্ত হইয়া বলিতেন রোজ রাত জেগে জেগে ও ছাই কর কি? মাখনলাল অপ্রতিভ হইয়া স্মিত আস্যে বলিতেন, কিছুনা একটা অঙ্ক মেলাচ্ছি। এমনি করিয়া তিন চারি মাস কাটিয়া গেল।

পাড়ায় পুঁটিরাম বাড়ুয্যে বলিয়া একটি ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাহার পিতা অনেক গুলি নগদ অর্থ রাখিয়া যান। পুত্র নানা প্রকারে তাহা নিঃশেষ করিয়া এখন শূণ্য ভাণ্ড হইয়াছেন। জ্যোতিষের উপর পুঁটীরামের অগাধ বিশ্বাস। সেই সূত্রে মাখনলালের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। পুঁটীরাম ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, ঘোড় দৌড়ের খেলা, লটারি টিকিট কিছুতেই তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, সম্প্রতি তুলার খেলার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। দুরদৃষ্টবশতঃ লাভের পরিমাণ অপেক্ষা লোকসানের পরিমাণই তাহার অধিক হইয়াছে। একদিন সন্ধ্যার পর মাখনলাল তুলার নম্বর নির্ব্বাচনে নিবিষ্ট ; বিমর্ষ বদনে পুঁটিরাম আসিয়া উপস্থিত হইল। মাখনলাল খাতা পেন্সিল সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এস এস, তোমার মুখ এত ভার কেন ? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পুঁটীরাম বলিল—আমি ভাই আজ অনেক গুলি টাকা হেরেছি ! মাখনলাল হাসিয়া বলিল কেনহে এত দেখে শুনে নম্বর ধরেছ, তবু হার, পুঁটীরাম বলিল—“আরে ভাই ওর কিছু ঠিক নাই, ফেভরিট নম্বর দেখিয়াই টাকা দিয়েছিলুম, সবই বরাত।” অবজ্ঞার স্বরে মাখনলাল বলিল—“কে বল্‌লে ঠিক বলা যায় না,

গণিত শাস্ত্রে মেলে না এমন বিষয়ই নাই। আমি নম্বর বলে দিই, কেমন ঠিক হয় না দেখ।” বিস্মিত ও উৎসাহিত হইয়া পুঁটীরাম বলিল—বল কি? এও তুমি জান-নাকি? আরে ছ্যা এতদিন বলতে হয়। আমি ব্যাটা রোজ গিয়ে হারছি। মাখনলাল গম্ভীরভাবে বলিলেন—এর আর জানা জানি কি ভাই? একটু গুনে গেথে দেখলেই ঠিক বলা যায়, তুমিওত আমাকে কোন দিন কিছু বল নাই। পুঁটিরাম বলিল—আমি কি ছাই জানি, যে তোমার এ বিদ্যা আছে; যাকগে যা' হবার হয়েছে, তুমি ভাই কালকের নম্বরটা বলে দাও, কিছু মেরে আনি। মাখনলাল অনেক গুণিয়া গাঁথিয়া একটা নম্বর বলিয়া দিলেন। পরদিন হাসিতে হাসিতে পুঁটিরাম আসিয়া বলিল—ভাই তোমার গণবার কি বাহাদুরী, ঠিকঠাক মিলেছে, আজ আশি টাকা পেয়েছি। ফেভরিট নম্বর দেখে যে ব্যাটারা ধরেছিল, সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। আজ ভাল একটা নম্বর বলে দাও। মাখনলাল দ্বিগুণ উৎসাহে আর একটী নম্বর বলিয়া দিল। সেবারও ঠিক হইল। লোকের মুখে মুখে সহরের সর্ব্বত্র এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর মাখনলালের বাড়ীতে দুর্গোৎসব ব্যাপার। সকলের

মুখেই তার গণনার সুখ্যাতি। সে গণনা প্রায়ই নির্ভুল হয়। তাহার অকাট্য তুলার নম্বর কখনই নিষ্ফল হয় না। ক্রমশঃই মাখনলালের নিজের মনেও এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। রাত্রির টিউসনি ছাড়িয়া দিয়া তুলার নম্বর লইয়া মাতিল।

সুখ্যাতি মানুষকে অধঃপাতের নিম্নস্তরে নামাইয়া দেয়। আবার এই সুখ্যাতিই মানুষের সর্ব্ববিধ উৎসাহ ও উন্নতির মূল। মাখনলাল সুখ্যাতির প্রভাবে দারুণ উৎসাহে গনণর কার্য্য চালাইতে লাগিল। একদিন চারুশীলা স্বামীকে বলিল,—দেখ ও সব খেলায় মাতা ভাল নয়। মাখনলাল হাসিয়া বলিল, আমিত আর নিজে খেল্‌ছি না। চারুশীলা বলিল—দেখ নিজে না খেল্‌লেও ও সংস্রব ভাল নয়। মানুষের মন না মতি, কখন কি হয় বলা যায় না। মাখনলাল বলিল—পাগল আর কি! চারুশীলা বলিল পাগল কেন? এই ত খেয়ালে পড়ে টিউসনি কয়টা ছেড়ে দিলে। লজ্জিত হইয়া মাখনলাল বলিল—কি করি বল, দশজন ভদ্রলোক বাড়ীতে আসে, তাঁদের ফেলে কি করে যাই। চারুশীলা বলিল—তুমি যাই বল, আমার কিছুই ভাল বোধ হচ্ছেনা। হয়ত তুমি ও কবে ওদের সঙ্গে পড়ে নিজে খেল্‌বে। মাখনলাল

হাসিয়া বলিল—ও সব বাজে বিষয় নিয়ে কেন মন খারাপ কচ্ছ, আমি কি পাগল হয়েছি? কিন্তু তাহার হৃদয় যে সুখ্যাতির অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহা সে ভ্রমেও বুঝিতে পারিল না। তাহার নিজের গনণার উপর নিজের একটা দারুণ বিশ্বাস গভীরভাবে অঙ্কিত হইতে ছিল। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পরের গুণিয়া দিয়া মাত্র মৌখিক সুখ্যাতিলাভ করিবার দারুণ মোহে বিবাহযোগ্যা কন্যাটির কথা একরূপ সে ভুলিয়া গিয়াছিল। একদিন চারুশীলা বলিল—"পরের গুণে দিয়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে দিন কাটাৰে টিউসন গুলোও ছেড়ে দিলে, মেয়ে গলায় আর রাখা যায় না, তার বিয়ের কচ্ছ কি?" এমন দেখা যায়, যে কথা মানুষ রোজ শোনে, ভাবের কোন ব্যত্যয় ঘটে না, সময়ে সেই কথাতেই মানুষের ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটে। আজ মাখনলালের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সুখ্যাতির মোহ সুখ-স্বপ্ন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়া সে দারুণ অন্ধকারময় নিজের ভবিষ্যৎ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিজের মনে একটা অজানিত পীড়া অনুভব করিতে লাগিল। সে রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে নানারূপ দুঃস্বপ্ন দেখিতে

লাগিল। পরদিন অফিসে গেল। কিন্তু তাহার মনের অসচ্ছন্দতা কিছুতেই দূর হইল না। বাঙ্গালীর কন্যা-দায়, তাহাতে দরিদ্র ভদ্রলোকের ! সৌখিন সুখ্যাতির প্রলোভনে সে এক বৎসরকাল নিশ্চেষ্ট অবস্থায় আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছে, ভাবিয়া আপনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিল সে যদি এই বৎসরকাল বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্র না দিয়া কিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তাহাকে এ আসন্ন বিপদে পড়িতে হইত না। সন্ধ্যার পর গণা-ইতে অনেক লোক আসিল। সে নিজের শরীর অসুস্থ বলিয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া শয্যা গ্রহণপূর্ব্বক আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

সকলেরই দিন যায়—দিন কাহারও পড়িয়া থাকে না—মাখনলালেরও দিন কাটিতে লাগিল। গৃহিণী কন্যার বিবাহের জন্য ক্রমশঃই ব্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মাখনলালের কোনই উপায় নাই, চতু-র্দ্দিকেই, অন্ধকার। কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়, ভাবিয়া ভাবিয়া মাখনলাল কেমন এক রকম হইয়া গেল। একদিন রাত্রে চারুশীলা কন্যার বিবাহের জন্য স্বামীকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল।

মাখনলাল নিরুত্তর শয্যায় পড়িয়া রহিল। সমস্ত রাত্রি নানারূপ চিন্তা করিয়া ভাগ্য ফিরাইবার জন্য সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহার নিজের গননার উপর তাহার নিজের একটা গভীর বিশ্বাস ছিল। সে মনে মনে স্থির করিল, খুব ভাল করিয়া গুণিয়া তুলার খেলা খেলিবে। কিন্তু টাকা কোথায়! অনেক ভাবিয়া স্থির করিল—অফিসের ক্যাশ হইতে হাজার টাকা একদিনের জন্য লইবে। কিন্তু এ কথা ভাবিতে তাহার হৃদয়ে সহস্রবার আঘাত করিয়াছিল; কিন্তু নিজের গণনার উপর দারুণ বিশ্বাস থাকায় আশঙ্কা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। প্রভাতে উঠিয়াই পূর্ব্বের মত খাতা পেন্সিল লইয়া তুলার নম্বর গণনা করিতে আরম্ভ করিল। তিন চারিবার করিয়া গুণিয়া একটি নম্বর স্থির করিল। আজ প্রাতঃকালে স্বামীকে খাতাপত্র লইয়া বসিতে দেখিয়া চারুশীলা বিরক্ত হইয়া বলিল—"ও আবার কি হচ্ছে? মিছে আর কেন পরের ঝঞ্ঝাট বয়ে মরছ? মেয়ে পার করবার উপায় দেখ।" পত্নীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কর্কশ-কণ্ঠে মাখনলাল বলিল,—"হাঁ, তাই কচ্ছি।" স্বামীর চক্ষুতে পৈশাচিক দীপ্তি দেখিয়া সতী-লক্ষ্মী

অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল, সন্দিগ্ধভাবে কম্পিত-কণ্ঠে বলিল,—"তুমি আজ নিজে খেল্‌বে বুঝি ?" দৃঢ়ভাবে মাখনলাল বলিল,—"হুঁ"। ভীত-কণ্ঠে চারুশীলা বলিল,—"না, না, তুমি ও খেলা কখনও খেলো না। জুয়াখেলা খেল্‌তে নাই, ওতে লোকের সর্ব্বনাশ হয়।" অদৃষ্টে যা' আছে তাই হবে। মাখনলাল বলিল,—"আবার লোকে বড়লোকও হয়।"

মাখনলাল অফিসে গেল। আত্ম-বিশ্বাস তাহাকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। অফিসের তহবিল হইতে এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ছুটির পর কম্পিত-পদে একটী তুলার খেলার দোকানে প্রবেশ করিয়া নির্দ্ধারিত নম্বরে হাজার টাকা ধরিল। চিন্তাক্লিষ্ট উদ্বেগপূর্ণ মুখভাব লইয়া সন্ধ্যার পর মাখনলাল গৃহে ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখভাব দেখিয়াই চারুশীলা বুঝিতে পারিল, স্বামী বিশেষ কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"খেলে এলে বুঝি ?" মাখনলাল স্ত্রীর দিকে মুখের উদার-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"হাঁ"। চারুশীলা চঞ্চল-

ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"টাকা পেলে কোথায় ?" শুষ্ককণ্ঠে মাখনলাল বলিল,—"অফিসের ক্যাশ থেকে নিয়েছি।" চারুশীলার বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে, আতঙ্কে; কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কত টাকা ?" এক নিশ্বাসে রুদ্ধ-কণ্ঠে মাখনলাল বলিল,—"হাজার টাকা।" কথাটি মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই চারুশীলার জল-খাবারের থালা হাত হইতে ঝনাৎ করিয়া পড়িয়া গেল, সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পরদিন আফিসের ফিরতি-মুখে সাগ্রহে মাখন-লাল দোকানে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কত নম্বর ?" উত্তরে যাহা শুনিল কর্ণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। শুষ্ককণ্ঠে সাগ্রহে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কত নম্বর বলিলেন ?"—হায়, এবার ভাই, তাহার নির্দ্ধারিত নম্বর নহে। মাতা-লের মত টলিতে টলিতে মাখনলাল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রকের উপর বসিয়া পড়িল। পিতাকে দেখিয়া বালক পুত্রটী ছুটিয়া পিতার নিকট আসিতেছিল কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক মূর্ত্তি দেখিয়া

আর অগ্রসর হইল না, ভীতভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিল। দারুণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লইয়া চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হলো?" মাখনলাল কোন কথা বলিল না—স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি ম্লান, নিষ্প্রভ, অস্বাভাবিক—উন্মাদের মত।

